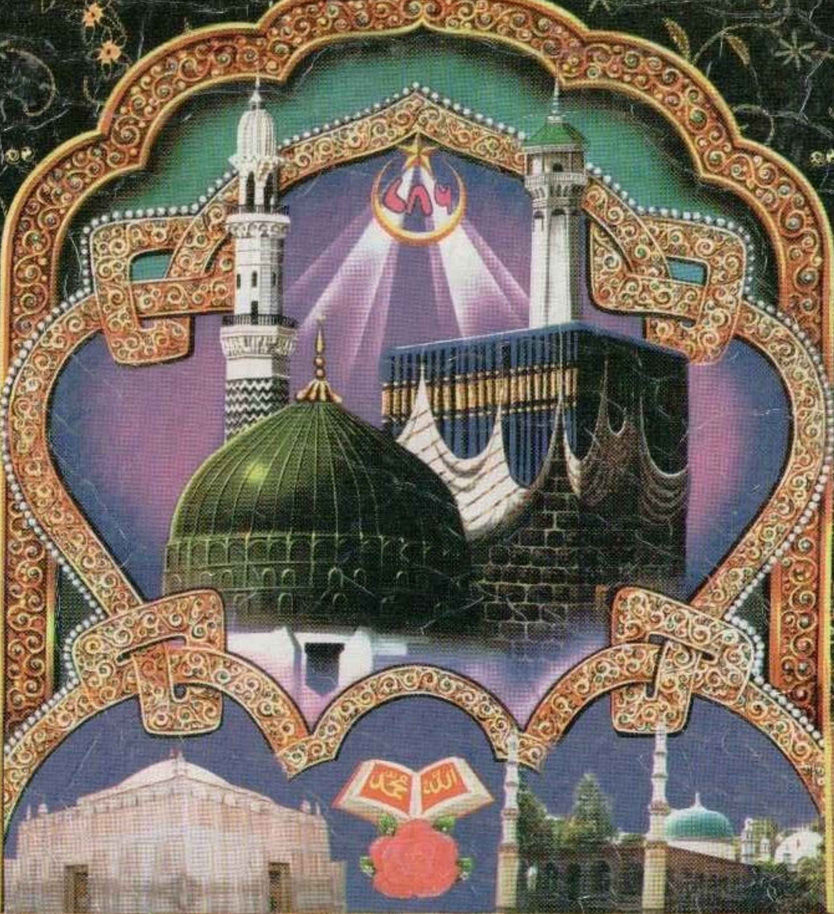

তারিখে মাদারে আলম

হজরত মৌলানা আলহাজ সৈয়দ
মহজর আলী বকারী মাদারী

মাকানপুর শরীফ, কানপুর
উত্তর প্রদেশ

তারিখে মাদারে আলম

লেখক ঃ
হজরত মৌলানা আলহাজ সৈয়দ মহজর আলী বকারী মাদারী
মাকানপুর শরীফ, কানপুর, উত্তর প্রদেশ

বাংলা অনুবাদক ঃ
সৈয়দ হাফিজুর রহমান তৈয়ফুরী মাদারী
আয়মা মাজার শরীফ, বাওয়ালী, নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা, পঃ বঃ

জাহাঁ যাইয়ে ইন কে চিল্লে হ্যায় মহজর।
মাদারে জহাঁ কা সফর আল্লাহ আল্লাহ।।

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

আয়মা মাজার শরীফ, আয়মা, বাওয়ালী, দঃ ২৪ পরগনা
বর্তমান পীর সৈয়দ হাফিজুর রহমান তয়ফুরি মাদারী
ফোন নং - ৯৮৩০৯২৪৪২০
খাজুট্টি সুফিজিম মাদারীয়া অর্গানাইজেশন আইম্মা মন্জিল
খাজুট্টি, বাদশামোড়, বাগনান, হাওড়া
৯৯৩২১০০৪২ (নূর)

প্রথম সংস্করণ ঃ-

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৪১৬ (ইং ২২শে অক্টোবর, ২০০৯)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ-

প্রকাশক

মুদ্রকঃ-

ফরিদ বাইন্ডিং এণ্ড প্রিন্টিং
দালালপুকুর, হাওড়া-৪

মল্যঃ-

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান ও শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের উপর এই কেতাব উৎসর্গ করলাম।

মাকানপুর শরীফ, জেলা ঃ কানপুর, উত্তর প্রদেশ।

১৭-জুমাদল মাদার, সন ১৪২৪ হিঃ।
সাল - ২০০৪
।০২।

হজরত মৌলানা আলহাজ
সৈয়দ মহজর আলী বকারী মাদারী

অনুমতি পত্র

هو البدیع

الحمدللہ بفضل حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ عنہ کی
کتاب تاریخ مدار عالم جو اردو زبان میں میں نے تحریر کی
تھی اس کا ترجمہ ہندی گجراتی اور انگریزی میں
ہو چکا ہے اب اسکا ترجمہ بنگالی زبان میں عالیجناب
ڈاکٹر سید حفیظ الرحمن جعفری مداری کر رہے
ہیں اس کار خیر کی اجازت دیتا ہوں اور دعاگو
ہوں کہ اللہ تعالیٰ بفضل قطب المدار اس کام
کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے
آمین

الحاج سید محمد عسکری جعفری المنعالی المعروف بہ ازہری مداری
سجادہ نشین آستانہ عالیہ مداریہ مکن پور شریف

28/8/09

অনুবাদকের পরিচয় ঃ

গোরোহ - ইমামিয়া হোসেনি। খানওয়াদাহ - তয়ফুরিয়া।
সিলসিলা - মাদারিয়া, তরিকা - আশেকান

বিসমিল্লাহের্ রহমান্ নিররহিম্,

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় দুইশত বৎসর আগে মাদারিয়া আশিকান তরিকার প্রচার করেন সূফি সাধক পীর হজরত সৈয়দ শাহ আল হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন কাদের বক্স শাহ কুদ্দুশোস সালোকিন জুল্লেয়ালা হাসানি আল হুসেনি (রঃ)। নিবাস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নোদাখালি থানার আয়মা গ্রামে। এরপর ওনার সুপুত্র হজরত সৈয়দ শাহ আল হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন আফ্তাব উদ্দিন শাহ কুদ্দুশোস সালেকিন জুল্লেয়ালা হাসানি আল হুসেনি (রঃ) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশিকান তরিকার প্রচার করেন। বিশেষ করে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ ওনার মাধ্যমে পবিত্র মাদারিয়া সিলসিলার ছায়াতলে আশ্রয় পায়। ঐ গ্রামেই দুই মহান সূফিসাধকের মাজার হয়। বর্তমানে ঐ স্থানে স্থলাভিসিক্ত পীর হজরত সৈয়দ শাহ আল্ হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন হাফিজুর রহমান তয়ফুরি হাসানি আল হুসেনি (রঃ)।

আমাদের শাজ্‌রা এ মুর্শিদিয়া নিম্নরূপ ঃ	ঠিকানা
হজরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)।	মদিনা শরিফ
হজরত সৈয়দ আমিরল মোমেনিন আলি করম আল্লাহ্ আজহ্।	নজফ আসরাফ
হজরত সৈয়দ খোয়াজা হাসান বসরি (রঃ)।	বসরা
হজরত সৈয়দ খোয়াজা হাবিবে আজমি (রঃ)।	আজম্ শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ সুলতানুল আরেফিন বাইজিদ বোস্তামি (রঃ)।	বোস্তাম
হজরত সৈয়দ শাহ বদিউদ্দিন কুতুবুল মাদার (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ কাজি মোতাহর জাহের বো রাহন (রঃ)।	মাওবার শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ কাজি হামিনদ্দিন বো রোহন (রঃ)।	মাওবার শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ সিরাজ উদ্দিন (রঃ)।	আমতা সিরাজবাটি
হজরত সৈয়দ শাহ আব্দুল গফুর (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ ইমান নৌরোজ (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ ফতেহ আলি (রঃ)।	মুন্সির হাট
হজরত সৈয়দ শাহ মীরা বল্ বল্ জ্যোতি (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ মীরাগোল মহম্মদ (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ স্বাদেক মহম্মদ (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ খেজের মহম্মদ (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ তাজ মহম্মদ (রঃ)।	হিজলী শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ ইব্রাহিম সয়লানি লঙ্কাপতি (রঃ)।	লঙ্কা
হজরত সৈয়দ শাহ হবিবুল্লা আলায়হে রহমত (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ জ্যোৎস্নালি (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ রমজান আলি (রঃ)।	মাকানপুর শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ জামাল উদ্দিন (রঃ)।	গোয়ালিয়র
হজরত সৈয়দ শাহ গোলজার মহম্মদ (রঃ)।	গোয়ালিয়র
হজরত সৈয়দ শাহ মওলানা সদর রহমত আলি (রঃ)।	কাসেমপুর
হজরত সৈয়দ শাহ আল হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন কাদের বক্স শাহ কুদ্দুশোস সালোকিন জুল্লেয়ালা হাসানি আল হুসেনি (রঃ)।	আয়মা রওজা শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ আল্ হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন আফ্তাব্ উদ্দিন শাহ কুদ্দুশোস সালেকিন জুল্লেয়ালা হাসানি আল হুসেনি (রঃ)।	আয়মা রওজা শরিফ
হজরত সৈয়দ শাহ আল্ হজ্জ্ব মওলানা সুলতানুল আরেফিন হাফিজুর রহমান তয়ফুরি হাসানি আল হুসেনি কুদ্দুশোস সালেকিন জুল্লেয়ালা (রঃ)।	আইম্মা মন্জিল খাজুট্টি

কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং সংশোধনী

সৈয়দ বদিউদ্দিন কুলকুতবুল মাদার (রঃ) ঃ জন্ম ঃ ২৪২ হিজরী, ১লা শওয়াল। / ৩১শে জানুয়ারী, ৮৫৭খ্রীঃ। মৃত্যু ঃ ৮৩৮ হিজরী, ১৭ই জমাদিয়ল আউয়াল / ১৪৫৩ খ্রীঃ।

গৌস পাকের সঙ্গে মাদারুল আলামিনের যখন সাক্ষাত হয় তখন মাদার পাকের বয়স ২৬৩ বৎসর এবং গৌস পাকের বয়স ৩৫ বৎসর। খাজাবাবার সঙ্গে মাদারুল আলামিনের যখন সাক্ষাত হয় তখন মাদার পাকের বয়স ৩৪৩ বৎসর এবং খাজাবাবার বয়স ৫২ বৎসর। (গুলিস্তানে মাদার পৃষ্ঠা-১০১), সিরত কুতবুল আলম পৃষ্ঠা-২৩, ২৪, ২৫)। তারিখে মাদারে আলম বই টি উর্দূ, হিন্দি, গুজরাটী, পাঞ্জাবী এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

সংশোধনী ঃ

লেখকের নিবেদন-৫৫৬ বৎসরের এর জায়গা হবে - ৫৯৬ বৎসরের মধ্যে ৫৫৬ বৎসরের। সরকার - এর সঙ্গে যুক্ত হবে মাদারে পাক। ইমাম - এর জায়গায় হবে - ইমান। ১৩ পৃষ্ঠায় জীনেদের বাদশার সঙ্গে মাদারুল আলামিনের কথোপকথন নিম্নরূপ ঃ

জীনেদের বাদশা, সালাম দিয়ে বলল - কত ভাল হত আপনি যদি গোলামের উপর দয়া করতেন। তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত সর্বদা ক্ষতিকর হয়। বাদশা বলল - আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ জয়ীর উপর জয়ী। বাদশা বলল - হুজুর এতদিন সংসারে বড় কষ্টতে কাটাচ্ছি এর থেকে মুক্তির উপায় বলেদিন। তিনি আবার বললেন, আল্লার রহমত বা দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না তিনি মহা দয়াবান, তিনি সমস্ত ইচ্ছাই পূরণ করেন। তুমি তোমার নফসের বিরোধিতা কর এবং আল্লার পথে পরহেজগারি কর। ১৩ পৃষ্ঠায় আছে হিজরী ২৪২ সন - হবে ২৮২ হিজরী।

প্রাপ্তিস্থান ফোন নং ৯৯৩২১০০৪২ আছে হবে ৯৯৩২৩১০০৪২ এছাড়াও আরো একটা ফোন নং দেওয়া হল ০৩২১৪-২৬৮ ৫০৪

লেখকের নিবেদন ঃ—

বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম

আলহামদুলিল্লাহ, তরিখে মাদারে আলম কেতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলার মাদার প্রেমী মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আমার মাদারিয়া আশিকান তয়ফুরিয়ান শাখার পীর ভাইদের খুব চাহিদা অনুযায়ী এই বইটি তাদের হাতে তুলে দিতে পেরে সেই পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানায়। এই পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম ভীরু মানুষের কাছে নুরে মহম্মদীর এক জীবন্ত প্রতীক সৈয়দ বদিউদ্দিন কুল কুতুবল মাদার, সবার কাছে মাদার সাহেব নামে পরিচিতি। এমন কি বাংলার গ্রামের মানুষের কাছে তিনি সত্যপীর নামেও সুপরিচিত। বাংলা ভাষার মাদার সাহেবের জীবনী অনুবাদ করেন সর্বপ্রথম আমাদের দাদা হুজুর কেবলা সুলতানুল আরোফিন আলহাজ্জ সৈয়দ কাদের বক্স শাহ তয়ফুরী মাদারী (আয়মা মাজার শরীফ) যাহা আমাদের লাইব্রেরীতে (গ্রন্থাগারে) সযত্নে সংরক্ষিত আছে উক্ত কেতাবের নাম সায়রুল মাদার। এরপর আমাদের হুজুর সুলতানুল আরেফিন আলহাজ্জ সৈয়দ আফতাব উদ্দিন আহম্মদ তয়ফুরী মাদারী সাহেব যে বঙ্গানুবাদ করান তার নাম মাদার-ই-আজম উক্ত কেতাব আমাদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আমি মাকানপুর সরকারের দরবারে হাজিরী দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম, উক্ত কেতাবের লেখক কেতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বলেন এবং এক অনুমতি পত্র লিখে দেন। আমি মাদারুল আলামিন কে জানিয়ে আমার পীরকে স্মরণ করে আল্লার নাম নিয়ে উক্ত বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করি। এই কেতাবের বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও সন দেওয়া আছে এবং এতে মাদারুল আলামিন ৫৫৬ বসরের জীবদ্দশায় পর পর ভারতবর্ষে এসেছেন এবং হজ্বে গেছেন। মদিনা কারবালা নজফ ও বাগদাদ গেছেন আবার পুনরায় ভারতবর্ষে এসেছেন, তিনি যে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করেছেন তার সুন্দর লিপিবদ্ধ করেছেন। ওনার জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে ওনার খাস খলিফাদের সম্বন্ধে দু-চার কথাও লেখা আছে। আমি পেশাদার অনুবাদক নয়, তবু করুনাময়ের কৃপায়, পীরের দয়ায় আসল কেতাবের মূল ভাব এক রেখে যত সম্ভব সহজ ও সরল করা যায় করা হয়েছে। এজন্য সাধু চলিতে সংমিশ্রন হতে পারে, সেজন্য মাদারুল আলামিনের দরগায় ক্ষমা প্রার্থী।

শেষে প্রার্থনা করি, সরকার যেন আমার এই খেদমত টুকু গ্রহন করেন এবং পাঠক বৃন্দ এই কেতাব পড়ে মাদারুল আলামিনের ফয়েজ প্রাপ্ত হন এবং তারই ওসিলায় নিসবতে মহম্মদী লাভ করেন।

আয় মাদার দো জাঁহা কাবায় ইমান মদদ দে।
নৌনেহাল চমনে শহীদ শাহে শহীদান মদদ দে।।
নওগুলে বাগে হাদী মেরে দ্বীন ও ইমাম পর মদদ দে।।
নওগুলে বাগে শামা দ্বীন ও ইমাম পর মদদ দে।।

আমীন।

অনুবাদক
সৈয়দ হাফিজুর রহমান
তয়ফুরী মাদারী

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৪১৬
২২শে অক্টোবর, ২০০৯

সূচীপত্র ঃ

১. হজরত মাদার সাহেবের জন্মভূমি
২. শাম দেশ সম্বন্ধে হাদিস
৩. হলব শহরের বিশেষত্ব
৪. আব্বাসি খলিফার দুশমনি সৈয়দ্ দের সঙ্গে
৫. ইসলামী দেশের ডাক
৬. হলবের প্রতিষ্ঠিত ঘর
৭. কুতুবুল মাদারের জন্ম
৮. বিস্‌মিল্লার অনুষ্ঠান
৯. প্রথম হজ্ব
১০. হজরত বায়জীদ পাকের নিকট মুরিদ হন
১১. মদিনায় ১ম হাজিরী
১২. ভারতে ১ম আগমন
১৩. জীনেদের রাজার মুরিদ হওয়ার ঘটনা
১৪. অন্ধ চক্ষু ফিরে পায়
১৫. শেখ মুহম্মদ লাহোরীর হজ্ব
১৬. সুরত শহরে উপস্থিতি
১৭. হুজুর খাম্বাতে
১৮. জিন্দাশাহমাদার ভড়োচে এলেন
১৯. ২য় হজ্বের সফর
২০. কুতুবে মাদার ইস্রাইলের জঙ্গলে
২১. মাদার সাহেব শাম দেশে
২২. শাহে তবকাত অহমদাবাদের মাটিতে
২৩. ওলীদের মহারাজা আবার খাম্বাতে
২৪. বাগদাদে বড়পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত
২৫. বদখস্থান থেকে প্রস্থান
২৬. মিশরের মাটিতে
২৭. জিন্দাওলা নীম রোজে
২৮. আজমেরে শহিদানদের লাশ
২৯. কুতুবে হবিকী আজমেরের মাটিতে
৩০. জাদুগর অধরনাথ মুসলমান হয়
৩১. সৈয়দ সালার মসুদ গাজীর জন্মের শুভ সূচনা
৩২. বাগদাদে বিবি নসীবার ফরিয়াদ
৩৩. ডুবন্ত নৌকাকে ভাষান
৩৪. পানি কুঁয়া থেকে বাইরে এল
৩৫. জান্নান জান্নাতির জিন্দা হওয়ার ঘটনা
৩৬. কুতুবুল মাদার মেবাতে
৩৭. কুতুবুল মাদার ভাতিন্দায়
৩৮. ৫২টা ডাকাত আউলীয়া হল
৩৯. বিভিন্ন শহরে প্রস্থান
৪০. ফিরোজ শাহ মুরিদ হল
৪১. কুতুবুল মাদার কালপীতে
৪২. কুতুবুল মাদার জৌনপুরে
৪৩. সিরাজুদ্দিন শাহ পুড়ে যাওয়ার ঘটনা
৪৪. কুতুবুল মাদার শাহ মীনাকে কুতুব বানায়
৪৫. কুতুবুল মাদার কিন্তুরে
৪৬. কুতুবুল মাদার ঘাটমপুরে
৪৭. গুজরাটে শেখ ইলিয়াস বয়েত হল
৪৮. ৭ম হজ্ব
৪৯. ইরানের ঘটনা
৫০. কাজী মসুদের মুরিদ যাওয়ার ঘটনা
৫১. হজরত আহমদ আরজ
৫২. হরসহে খাজেগান ওনার সাথে যাত্রা করেন
৫৩. হজরত শেখ ইশাকে প্রশ্ন
৫৪. ফুলের সঙ্গে কথা
৫৫. নমাজে অন্য মনস্ক
৫৬. মালেকুল উলামার প্রশ্ন
৫৭. সৈয়দনা জিন্দা মাদার জৌনপুরে ফেরা
৫৮. সরকার মাকানপুর এলেন
৫৯. সৈয়দনা জিন্দা মাদার দ্বারা কনৌজের বিমারী দূর
৬০. রাজগীরে ফৈয়জান এ কুতুবুল মাদার
৬১. কাজী সৈয়দ সদরুদ্দিন
৬২. সৈয়দনা জিন্দা মাদার জৌনপুরে আগমন
৬৩. সৈয়দনা জিন্দা মাদার থেকে অজমল অজমলী ফয়েজ পায়
৬৪. জাদুগরের ইসলামে দাওয়াত
৬৫. এক মহিলার নিবেদন
৬৬. পল্লরায় এর উপর দয়া
৬৭. ইসন নদী
৬৮. মাবার শরীফে ফয়েজ
৬৯. হর সহ খাজগান
৭০. বিষধনের জাদুগর
৭১. মক্কন সরবাজ মাদারী
৭২. বিবি বহোর
৭৩. খাজা ফজুরের কারামত
৭৪. খাজা সৈয়দ অবুল হসন তৈফুরী
৭৫. হজরত মাদার সাহেবের পর্দা নেওয়া
৭৬. দরগাহ পীর হনীফ মদারী বলরামপুর
৭৭. দরগাহ পীর হনীফ এর শিজরা এ মুর্শিদিয়া
৭৮. হজরত সৈয়দ অব্দুর রহমান উর্ফ বাব মলঙ্গ মদারী
৭৯. জুনাগড়ের ঘটনা
৮০. শিজরা এ জদিদয়া সৈয়দ মহজর আলী
৮১. শিজরা এ মুর্শিদিয়া হজরত সৈয়ত মহজর আলী

নাত শরীফ

দিল ইক্ পল্ আরাম না পায়ে, বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।
রো রো কে তৌবা য়াদ আয়ে,বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

রহমতে আলম আপকী য়াদে কাম আজাতী হ্যায় বরনা।
কৌন হামারা দিল বহলায়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

দিনকে উজালে শরমাতে হ্যায় উন নুরানী গালিয়োঁ সে।
আখোঁমে তৌবা খিচ আয়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

আলমে তন্হাই মে আকা তেরা তসব্বুর তেরা জামাল।
সোয় এহসাসাত জাগায়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

ইস্ক কা মারা দিল বেচারা জব কোই উস্ কা বস্ না চলা।
হিজরে নবী মে আঁশু বহায়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

অপনে কাফুরী হোঁঠো সে চুমে কদম য়া দে আবাজ
কিস তরহ জিবরীল জাগায়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

দিল মে কসক প্যায়দা হোতী হ্যায় আঁখে নম হো জাতী হ্যায়।
জব মহজর তু নাত শুনায়ে বো ভী ইত্নী রাত গয়ে।

(হজরত মৌঃ আলহজ্জ্ব সৈয়দ মহজর আলী বখারী মাদারী)

======

মনকাবাত শরীফ

হ্যায় আউলিয়া মে বড়ে বা বকার পহচানো।
অগর নজর হ্যায় তো ক্যা মদার পহচানো।।
অদব সে পলকে বিদ্যতে জহাঁ হ্যায় আলমগীর।
মাদারে পাক কা বোহ হ্যায় দয়ার পহচানো।।

জো চাহে কত্‌র কো মাজুল কুত্‌বিয়ত সে করে।
খুদা নে বক্স হ্যায় বো ইখতিয়ার পহচানো।।
নিসার জিন কে কদম পর হ্যায় আজমতে অফলাক।
উন্হী কো দর কা হুঁ ম্যায় খাকসার পহচানো।।

মাদার ফুল হ্যায় এ্যায়সা কি নিকহত সে।
হ্যায় গুল সিতানে বিলা মে বহর পহচানো।।
মাদার উসকো হ্যায় কহতে কি জাত পর জিসকী।
হ্যায় কাইনাত কা দারো মাদার পহচানো।।

হর এক সিলসিলা সৌরব জিসসে হ্যায় মহজর।
হ্যায় ইন কী নিস্বতে বো আবশার পহচানো।।

(হজরত মৌঃ আলহজ্জ্ব ক্বারী সৈয়দ মহজর আলী সাহেব)

========

হাম্‌দে বারি তায়ালা

হাম্‌দ তেরী কিস জবাঁ সে করেঁ এ কিরদার।
তেরে খুদ ঔসাফ সে হ্যায় তেরী মিদহত।
কাদিরে মুত্তলক হ্যায় তু শয় পে তেরা ইখতিয়ার।।
তু হি হ্যায় খালিক হামারা তু হি হ্যায় পরবর দিগার।।

এ ফজায়েঁ এ হাবায়েঁ ওহ জমীনো আসমাঁ।
মাহতাবো মেহরো অন্‌জুম তেরী কুদরত কে নিশাঁ।
ঔর গবাহী দে রহী হ্যায় গর দিশে লৌলো নহার।।
তু হি হ্যায় খালিক হামারা তু হি হ্যায় পরবর দিগার।।

কারসাজী কে তসদ্দুক দিল বোহ য়ারব কর আতা।
জিস্ কী কিসমত বন গই হো উলফতে খ্যায়রুলবরা।
আলো অস্থাবে নবী কা বক্স দে হম কো শিয়ার।।
তু হি হ্যায় খালিক হামারা তু হি হ্যায় পরবর দিগার।।

আখিরী দিল কী তমান্না হ্যায় 'বলী, কী য়া খুদা।
জীস্ত কা ইস্‌লাম পর ইমান পর হো খাতমা।
হো য়হী লব পর উঠে মরকদ সে জব রোজে শুমার।।
তু হি হ্যায় খালিক হামারা তু হি হ্যায় পরবর দিগার।।

(হকীমুল উম্মত হজরত আল্লামা হাকীম সৈয়দ মুহম্মদ বলী শিকোহ মিয়াঁ বলী মাদারী রাজিঃ)

======

তরিখে মাদারে আলম

।।হজরত মদার সাহেবের জন্মভূমি ।।

হজরত মদার (রাজিঃ)সাহেবের জন্ম সাম দেশ বা সিরিয়ার হলব্ নামক শহরে।হলব শহর সিরিয়া বা সাম দেশের নামকরা ও এক পবিত্র শহর। সাম দেশ আরবের এক প্রতিবেশী দেশ।আরব দেশ হিন্দ মহাসাগর,এবং লাল সাগরে ঘেরা শুষ্ক মরুভূমি এলাকা।এই মরুভূমি এলাকার অন্তরভুক্ত ইরাক ও সাম দেশ। সিরিয়ার সঙ্গে যে লাল সাগর মিলিত হয়েছে ওখান থেকে ইয়ামান পর্যন্ত উপকুলবর্তী ভূ ভাগ কে হিজাজ বলে। পবিত্র শহর মক্কা,তাইফ য়াসরব অর্থাৎ মদিনা এই হিজাজ এর মধ্যেই পড়ে।আর এই শহরের সঙ্গে রহমতে আলম (সাঃ)-র জীবনের সঙ্গে একটা গাঢ় সম্বন্ধ আছে।

এ সেই মক্কা যেখান থেকে রসুলে (সাঃ)মানবিকতা ও দয়ার এমন দ্বীপ জ্বালিয়ে ছিলেন যাতে আন্ধকার ময়ী সংসারের কোনে কোনে উক্ত আলোয় আলোকিত হয়ে চমকাতে থাকে।

এ সেই তাইফ যেখানের মানুষ হুজুর (সাঃ)-র উপর পাথর মারে এর বদলে হুজুর (সাঃ) দোয়া,দয়া, এবং ভালবাসার ফুল ছড়িয়েছেন। আনসারদের ত্যাগ, মহাজিরিনদের ভালবাসা উম্মাহাতুল মোমেনীন ও পাঞ্জাতনদের উজ্জ্বল চরিত্রের সারা খাজানা ইসলাম দুনিয়া এই মদিনা থেকেই পেয়েছে।

যেমন হিজাজ প্রদেশের গৌরব ইব্রাহিম (আঃ) আপন পুত্র ইসমাইলকে এই মরুভূমির মাঝে রেখে যায় , যেখানে এক ফোঁটা পানি কোথাও ছিল না।তেমন সাম দেশের ও ঐ রুপ এক গৌরব এই পবিত্র ভূমিতে তাঁর আর এক পুত্র ইশাহক কে রেখে ছিলেন।

সাম দেশেই সর্বপ্রথম ফৌজী হামলা হয়েছিল।তখন আবুবকর সিদ্দিক -র খেলাফত ছিল, উক্ত দিনেই ওনার মৃত্যু হয়। ঐ দিন ইসলামি ফৌজী দামিস্ক দখল করে এবং সাম দেশপুরো দখল করে এবং জয় করে উমর ফারুক এর আমলে ১৭হিজরী সন ৬৩৮ খ্রীঃ তে।সামদেশ মুসলমানরা জয় করে নেওয়ায় উক্ত দেশের মানুষ ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আসতে লাগল।যেখানে হুজুর (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই এখানে ইসলামের আলো পৌছেছিল।সাম দেশের ও দাস্তানে ইস্ক কি ও মেরাজ প্রাপ্ত হয়েছিল, যখন হজরত বেলাল (রাঃ) হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর বিয়োগ যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছিল না তখন তিনি এখানেই বেশ কিছু সময় ছিলেন।

সামদেশ সম্মন্ধে হাদিসের উল্লেখ :-

সামদেশ বা সিরিয়া সম্মন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য হাদিস হুজুর (সাঃ) করেছেন। উদাহরন স্বরুপ - হজরত আবু উমামা বয়ান করেছেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন সামদেশ আল্লার পছন্দসই দেশ।এখানে আল্লার নেক বান্দারা আসে এবং যে ওখানে যায় সে আল্লার রহমত পায়।যে ওখান থেকে চলে যায় আল্লার রোষ দৃষ্টি তার উপর পড়ে।হজরত আবদুল্লার সুপুত্র তিবরানী (রাঃ) বয়ান করেন,হুজুর (সাঃ) বলেছেন শেষ সময়ে এক আগুনের গোলা বের হবে, যা মানুষ কে ঘিরে ধরবে।তখন সাহাবারা হুজুর (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন ঐসময়ে আমাদের জন্য কি হুকুম বা আদেশ করেন । তখন হুজুর (সাঃ) বলেন, তোমরা সাম দেশে চলে যেও।এরপর হজরত উমর (রঃ) বলেন ,কোনো এক সময় হুজুর (সাঃ) বলেন - আমি আমার মাথা থেকে এক নূরের জ্যোতি বের হতে দেখলাম যাহা সাম দেশে গিয়ে থেমে গেল।এই হাদিস গুলি ছাড়াও সাম দেশের ফজিলত ও বরকত সম্মন্ধে আরো হাদিস তিনি বর্ননা করেছেন।সামদেশ বড় বরকতময় দেশ।যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহরের নাম হল দামিস্ক,অন্তকিয়া হলব ইত্যাদি।

হলব শহরের বিশেষত্ব

হলব শহর যতনা সুন্দর তার থেকে বেশী এর বিশেষত্ব।প্রাচিন কাল থেকেই এর নাম জনপ্রিয়।এখানকার দূর্গ বহু প্রাচীন ও মজবুত।বহু লোক চলে গেছে বহু সময় কেটে গেছে সেই দূর্গ ঠিক আছে।আগের লোক বলে এখানের বিষয় সম্পত্তি এত তবু মৃত্যু তার নাম পর্যন্ত রেখে যায় নি।আফসোস ২য় বার ঘুরে আর কেউ আসে না।

এ সেই হলব শহর যেখানে হাজার হাজার বাদশাহ এবং জাগিরদার গুজরে গেছে যাদের নাম ও নিশান এখন আর নেই।এখানে বহু বাদশাহ হুকুম চালিয়েছে এবং সেনার জোরে এই দেশ জয় করেছে।সবথেকে পরে ইবনে হমদান নামে এক বাদশাহ এসেছিল যিনি এই দেশ কে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু বয়সের কাল এসে তাকে এমন সময়ে নিয়ে গেল, তা সংরক্ষনের জন্য সে আর ফিরে আসতে পরলো না।

কিন্তু এখন যেখানে শহরের দূর্গ সেখানে প্রথমে উঁচু টিপি বা ছোটো পাহাড় ছিল। উক্ত ডিপির উপর ইব্রাহিম (আঃ) একবার নিজের বকরির বা ছাগলের দুধ দোহোন করে ছিল।তখন থেকে ঐ জায়গার নাম হয় হলব। কারন আরবরা দুধ দোহন কে হলব বলে।আর তখন থেকে ঐ শহর হলব নামে পরিচিত হয়।

আব্বাসী খলীফার সঙ্গে সৈয়দের শত্রুতা :-

মুল্ক সাম বা সাম দেশের উক্ত বিশেষত্বর সাথে সাথে এখানে দৈবীয় অপদাঁও এর নিরঙ্কুশ প্রকোপ ছিল।হজরত বদিউদ্দিন (রঃ) জন্মের দশ বৎসর আগে অর্থাৎ হিজরী ২৩২ এ হলব এবং এর চারিদিকেই নয় পুরো সাম দেশে ইরাক, খুরাসান,ইত্যাদিতে প্রায় দাঙ্গা-ফাসাদ লেগে থাকতো।ঐ দেশ ও আরো কিছু দেশ উক্ত দৈবীয় অপদাঁও গ্রস্থ ছিল।হিজরী ২৩২ অর্থাৎ ইং ৮৪৬ খ্রী আব্বাসীয় শাসন কালে।বাসিক বিল্লাহ বিন মৌতসিম মৌতসিম এর পরে ওর ভাই জাফর মৌতসিমমুতবক্কিল অল্লাহ গদিতে বসে, ঐ সময় ওর বয়স ছিল ২৭ (সাতাশ)বৎসর। খরিজ্মি লোডির পুত্র সুজা যে খুব সখদার ছিল। ইনিই কোরান নিয়ে যে ফিৎনা বা মতবিরোধ ছিল তা একেবারের জন্য বন্ধ করেছিল।যাহা বহু বিদ্যান ধর্ম জ্ঞানীর প্রান নিয়েছিল।

খলীফা মামুনের শাসন কাল থেকে বাসিক এর শাসন কাল পর্যন্ত এই সমস্যা খুব বেশী ছিল।উনি এই বেমিশাল কাজ করেছিলেন। এইরুপ ভাল গুনের সাথে সাথে ওনার অনেক অপগুন ও ছিল। যেমন ওনার নিজের ব্যক্তিগত জীবন খুব রঙিন ও বিলাসিতায় ভরপুর। ঐতিহাসিক মাসুদ লিখেছেন, উনি শরাব বা মদ এবং সুন্দর নারী বালবাসতেন।এনার আর এক অপগুন হল, আহলে বায়াত সম্পর্কে ঘৃনা,যার কারনে রাজ্যের সমস্ত প্রজা ওনাকে ঘৃনা করতো।শহিদ দের এমন শত্রু ছিল যে হজরত ইমাম হোসেন আঃ এবং অন্যান্য শহিদদের মাজার ভেঙে সেখানে চাষবাস করার জন্য আদেশ করে।ও ওখানে জিয়ারত বন্ধ করে দেয়।এইকাজ উনি হিঃ ২৩৬ সালে করেছিল।মুতবক্কিলের শাসন কালে ইসলামি রাজ্যের উপর দৈববীয় অপদাঁও এর প্রভাব এত বেশী ছিল যা এর আগে কখনো ছিল না।

ইসলামী দেশে ওনার ডাক :-

হিজরী ২৩৬ তে ইরাকে এমন এক ভয়ানক হাওয়া বইতে থাকে যাতে সমস্ত শহর কুফা,বসরা,বাগদাদ এবং আরো অন্যান্য শহরের চাষবাস নষ্ট হয়ে যায়।বাজার ও রাস্তাঘাট সব সুনসান বা ফাঁকা হয়ে যায় এমন কি হমদান শহরেও এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই গরম ভয়াবহ হাওয়া প্রায় দু মাস চলেছিল।যাতে বহু লোক মারা যায়।শহর অসকলান আগুন লেগে পুরো ধ্বংস হয়ে যায়।২৪০ হিজরীতে এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা যায় যার ভয়ে বহু লোক মারা যায়।এর ফলে ইরাকের সমস্ত চাষের জমি নষ্ট হয়ে যায়।দামিস্কে এমন ভূমিকম্প হয় যাতে বড় বড় উঁচু ঘর বাড়ি পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় ৫০ হাজার লোক মারা যায় ঐ সময়।এই ভূমিকম্প প্রকোপ ফারস, খুরাসান, য়ামন, শাম ইত্যাদিতেও পড়ে।সন ২৪২ হিজরীতে টয়ুনসরে, খুরাসান, নীসাপুর,তিবরিস্থান, তথা অস্ফহানে এমন জোরদার ভূমিকম্প হয় তাতে পাহাড় পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।ভূমি ফেটে যায়,আকাশ থেকে ৫ - ৫ কেজি করে পাথর বর্ষাতে থাকে। এদিকে হিজরী ২৪২ এ শাম দেশের হলব শহরে অন্যরকম চেহরা ছিল। রমজান মাসে সাদা রঙের এক পাখি আসে এবং এক আওয়াজ দেয়,- হে লোক সকল তোমরা আল্লার নাম কর।২য় দিনেও ঐ একই ঘটনা ঘটে ফলে

লোকেদের মধ্যে ভয় এবং চিন্তা ঘুরতে থাকে,রমজান মাসের শেষ তারিখ লোক ইদ্ মানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।রমজানের চাঁদ শেষ হয়েছে,ইদের চাঁদের সাথে সাথে কুত্‌বুল মাদার জিম্দাশাহ মাদারের জন্ম হয়।যেন এক নতুন যুগের সূচনা হল।প্রত্যেক রাতের পর প্রভাত অবশ্যই হবে।অন্ধকারময় খাপছাড়া জীবনের অবসান হল এবং আলোকজ্জ্বল জীবনের সূচনা হল। এক সামসুল আফ্লাক আসছে। আজ ইদের চাঁদ দুনিয়ার হিদায়ত এবং পরিবর্তনের জন্য নতুন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে। আকাশের তারার মত নতুন চমক লাগছিল। এমন ই হয়, সংসারের রচয়িতা খোলা আকাশের মুক্ত খুশি সারা শহরে ভরে দিয়েছেন। আজকের রাত চক্ চকে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয় কেননা এর সকালটা বেলায়েতের এমন এক সূর্যের আবির্ভাব হয়েছে।যার রশ্মিতে সংসারের যত বেদিন ছিল তারা ইসলামের এই আলোয় চক্ চক্ করতে থাকলো। এই তো কারন, যে আজ মানুষের মধ্যে কোন ভয় বা আতঙ্ক নেই।এখানে শুধুই সুখ এবং শান্তিতে মানুষ বসবাস করছে।

হলবের প্রতিষ্ঠিত ঘরের সন্তান :-

হলব শহরে প্রতিষ্ঠিত ঘরের মধ্যে সৈয়দ বহাউদ্দিনের ঘরের মত ঘর বহু খুঁজেও পাওয়া যায় না।ওনার চরিত্র চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং গুলাবের সুগন্ধের মত ওনার নাম হলব শহরের চারিদিকে প্রশিদ্ধ ছিল। হজরত সৈয়দ বাহাউদ্দিনর চার পুত্র ছিল,তাদের নাম যথাক্রমে সৈয়দ আহম্মদ, সৈয়দ মহম্মদ, সৈয়দ মহমুদ অর্থাৎ সৈয়দ কিদবতুদ্দিন অলী হলবী এবং আর একজনের নাম মকসুদ উদ্দিন, যাকে বদুদ্দীন নামে জানা যায়। ২য় পুত্র মতলুব উদ্দিন যে রোজ রাত্রে এক হাজার রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। ৩য় পুত্র নিজাম উদ্দিন, যে দিন ও রাতে এক কুঁজো পনি পান করে থাকতো।ইনি একজন মহান সাধু যিনি সব সময় এবাদত এবং তপস্যায় মসগুল থাকতো।ইনি খাজা বক্তাস ওলী নামে জানা যায়।যতদুর জানা যায় ঐ তিনজনের পরিচয় ওনারা নিজে নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন,কিন্তু হজরত সৈয়দ বদিউদ্দিন আহমদ জিম্দা শাহ মাদার রাজিঃ ওনার এমন সু পুত্র, যিনি মনের ইচ্ছা কি, যে ওনার পুত্র সংসারের কর্মকান্ডে অন্যায় অত্যাচার তথা হিংসার ঘটনা দ্বারা অন্ধকার করা সংসারকে নিজের ধর্ম ইসলামের আদর্শ দ্বারা উজ্জ্বল করে দেয়,ওনার পিতার দোয়া ছিল যে, হে রব আমাকে এমন পুত্র দাও যে তোমার পৃথিবীতে তোমার ধর্ম ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে, এবং তোমার নামের এবাদত পুরো সংসারে যেন হয়।এবং নিজের পুরো জীবন তোমার রসুলের (সাঃ) আদর্শ মত চলে।ওনার প্রার্থনা রব কবুল করে এবং অমূল্য রত্ন রুপে ওনার পুত্র বদিউদ্দিন কে দান করেন,যিনি জিম্দা মাদারনামে বিখ্যাত হন।

হজরত আলী হলবীর ইচ্ছা পুর্ন হওয়ার জন্য হজরত মহম্মদ সাঃ স্বপ্ন যোগে বললেন,হে আলী হলবী তোমার দোয়া কবুল হয়েছে।শীঘ্রই তোমার এক পুত্র সন্তান হবে।তুমি তার নাম রাখবে বদিউদ্দিন আহমদ। ও বেলায়েতের সূর্য হবে এবং সংসারে ইসলামের আদর্শ কে প্রকাশিত করবে। উনি বড় বুজর্গ এবং কারামত ওয়ালা হবে।আল্লাহ তায়ালা ওকে কুতবুল মাদারের দর্জ্জা দিয়ে সুশোভিত

করবে।তোমার ঐ সন্তান লাখ লাখ লোকের হৃদয় জয় করবে এবং ইসলামের সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সম্পূর্ন রুপে সংসারে ছড়িয়ে দেবে এবং অন্যায় অত্যাচার শোষন ইত্যাদি শেষ করে দেবে।

।।কুতবুল মাদারের জন্ম।।

জন্ম বৃত্তান্ত :-

হিজরী ২৪২ সন (ইং ৮১৬ খ্রীঃ) - ১লা শওয়াল সোমবার ভোরে, ইদের দিন তখনো সুর্যের কিরণ পৃথিবী থেকে অনেক দুরে, রাতের কালো আঁধার আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ভোরের আলো সবে ফুটে উঠছে,ভোরের সু মধুর ও সু শীতল বায়ু তে ধরনী মুখর হয়ে উঠেছে।কেননা আজ আলী হলবীর ঘরে ফাতেমা সানিয়ার কোলে এমন এক প্রস্ফুটিত গোলাব খেলছে যার কারন সমস্ত সংসার সুগন্ধে ভরে গিয়েছে। হজরত সৈয়দ ইদ্রিশ হলবী বলেন, যে সময় হজরত মাদার সাহেব এই দুনিয়াতে এলেন তখন সর্ব প্রথম নিজে নিজেই আল্লার উদ্দেশ্যে সেজদা করে এবং কলেমা শাহাদত পড়ে। ঐ সময় নূরের জ্যোতিতে সমস্ত ঘর ভরে যায়।হুজুর সাঃ ওনার সাহাবা তথা খিজির আঃ ফাতমা সানিয়ার ঘরে আসেন এবং ঐ বাচ্চার জন্য পিতা আলী হলবী কে মোবারকবাদ দেন।ঐ সময় ধীরে ধীরে হাওয়ার মধ্যে কোরান শরীফের নিম্নক্ত আয়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল, - অলা ইন্না আউলিয়া অল্লাহি লা খৌফুন আলায়হিম বলাহুম য়হ জনুন (কুরানের আয়াত)। আলীর বেটা এমন যে দেখে তো তার খোদাকে স্মরন হয়।এমন মন মোহিনী মূর্ত্তী যেন খোদা নিজে হাতে বানিয়েছেন।যেন তার শরীর দিয়ে নুরের ছটা বেরোচ্ছে। পিতা নাম রাখলেন বদিউদ্দিন আহমদ। মা বলেন যে ,গর্ভাবস্থায় যদি মুখে কোনো সন্দেহজনক জিনিষ দিয়ে ফেলেছি তো অমনি পেটে ব্যাথা অনুভব করতাম। আজগুবি স্বপ্ন দেখতাম,এবং ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ শুনতাম যাতে হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে যেত।যখন উানি ছোট ছিল তখন ওনার মায়ের দুধ ই ছিল একমাত্র আহার, সেই সময় মা যদি বিনা অজুতে থাকতোতাহলে উনি দুধ পান করতেন না।উনি যদি ছোট অবস্থায় কাঁদতেন এবং আযানের আওয়াজ শোনা যেতো তবে উনি সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যেতেন।যদি ওনার কাছে কোরান পড়া হত তো উনি তাহা ধ্যান মগ্ন হয়ে শুনতেন।যে দেখতো সেই বলতো এ বাচ্চা জন্ম থেকেই ওলী আছেন।

।।বিসমিল্লা কি রস্ম।।

দেখতে দেখতে মাদারুল আলামীনের বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন যখন হল তখন রস্মবিসমিল্লাহ আদায় করা হল।]

নোট : - রস্মবিসমিল্লাহ কি? -যখন বাচ্চার বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন হয় তখন উক্ত বাচ্চাকে কোনো বুজর্গ ব্যাক্তির দ্বারা বিসমিল্লা শরীফ এবং কোরানের খাস খাস আয়াত তাকে পড়ানো হয়। এই রস্ম বা অনুষ্ঠান সাজাতে মকনপুর শরিফে

আজো বাচ্চাদের মাদার সাহেবের দরগাহে নিয়ে গিয়ে আদায় করে তবে বাচ্চাদের স্কুলে বা বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়।

।।শিক্ষা।।

যখন এই রস্মবিসমিল্লাহ হয়ে গেল তখন আব্বাজান সেই সময়ের বিশাল আলেম ,বিদ্যান, জ্ঞানী ব্যক্তি হজরত সদীদদুদিন হোজাইফা শামী রহঃ যিনি পুরো দেশে জনপ্রিয় ছিল, ওনার কাছে পড়তে পাঠালেন।

হজরত হোজাইফা শামী এই নুতন শিষ্যকে পুরো ধ্যান দিয়ে পড়ানো শুরু করলেন।আর বললেন, পড় বিসমিল্লাহ হিররহমান নিররহিম,আবার বললেন পড়ো আলিফ,তিনি তো ঐ আলিফের ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন।এই অল্প বয়সের বাচ্চার মুখে আলিফের ব্যাখ্যা শুনে খুব আশ্চর্য হলেন। এমন ঐ ব্যাখ্যা এক সপ্তাহ পর্যন্ত করতে থাকে।আলিফ কাকে বলে ? কোন অবস্থায় আলিফ হয়? বর্ণমালায় আলিফের স্থান কোথায়? ইত্যাদি। ঐ সব শুনে গুরুজী বলে উঠলেন হাজা ওলী উল্লাহ,এ বাচ্চা একজন আল্লাহর ওলী।

নোটঃ - কিতাব গুলজার মাদার এর লেখক মৌলানা সৈয়দ মহমুদ লিখেছেন হোজাইফা শামী নিজে বলেছেন,স্বপ্নে নবী করিম সাঃ আদেশ করেছেন যে, উক্ত বাচ্চা (মাদার সাহেব) আমার বংশ থেকে তৈরী সুতরাং এর উপর বিশেষ করে ধ্যান দেবে।এমতাব্যস্থায় সৈয়দ বদিউদ্দিন জিন্দা শাহ মাদার রঃ খুব অল্প সময়ে, মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কোরয়ান পাক কণ্ঠস্থ করেছেন এবং ওর তফসির বা ব্যাখ্যা পড়েছেন। এর সাথে সাথে প্রচলিত বা সাধারন বিষয় এ ও বিশাল জ্ঞান অর্জন করেন।হজরত মাদার সাহেব ইল্ম এবং লগন্ অর্থাৎ শিক্ষা ও সদগুনের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে সবার কাছে প্রশিদ্ধ হতে লাগল।হজরত মাদার সাহেব কোরানের সাথে সাথে বাকি সব আসমানি কেতাবের ও হাফেজ ছিলেন।সুতরাং তিনি রীমিয়া, কীমিয়া, হীমিয়া, সীমিয়া সব বিষয় ই জানতেন। নোটঃ - ইল্ম হীমিয়াঃ - জাদুর মত, ইল্ম রীমিয়াঃ - যার সাহায্যে ব্যক্তি মুহূর্তে এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যেতে সামর্থ হয়। ইল্ম সীমিয়াঃ - যার সাহায্যে আত্মাকে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে দেওয়া যায়। ইল্ম কীমিয়াঃ - ইহা ঐ বিদ্যা যার দ্বারা লোহাকে সোনাতে পরিবর্তন করা যায়।

সিলসিলা এ মদারিয়ার বহু ভক্ত বা মুরিদ ঐ বিদ্যা জানতো।গুজরাটের বরোদায় মাজার যাঁর নাম হজরত বাবা দরিয়ায় মান, উনি বলতেন -আমার আত্মা শরীর থেকে চলে যেত, আবার আমি যখন চাইতাম তখন আবার ফিরে আসতো। ইহাকে শগ্লে ইন্তেকালি রুহ বলে।(আত্মা শরীর থেকে চলে যাওয়া)।

তাজকিরতুলকরাম ফি অহবালে খুলফা এ আরবী ইসলাম - এ লেখা আছে মাদার সাহেব চারটে আসমানী কিতাবেই হাফেজ ছিলেন।

প্রথম হজ্জ

যখন মাদার সাহেব সব রকমের শিক্ষা গ্রহন শেষ হল।তখন তিনি পিতার নিকট থেকে সিলসিলা এ জাফরিয়া এর খেলাফত পেলেন।অর্থাৎ লোককে জাফরিয়া সিলসিলাতে মুরিদ করার অনুমতি পেলেন।এর পর হজ্জ করার জন্য এবং মদিনা মনোয়ারা জিয়ারত করার জন্য মনে প্রবল ইচ্ছা হল।মা বাবার অনুমতি নিলেন এবং মিনতি করলেন,যে আমার উপর দুটি হক বা দায়িত্ব আছে এক আল্লার, ২য়ত আপনাদের।এখন আমি চাই আপনারা আমাকে আল্লার উপর সঁপে দিন যাতে আমি সমস্ত রকম ভাবে আল্লার হক আদায় করতে পারি। মা বাপ খুশি খুশিতে অনুমতি দিলেন এবং বললেন আমরা তোমাকে আল্লার রাস্তায় ছেড়ে দিলাম। হজরত মাদার সাহেব মা বাপের অনুমতি নিয়ে মক্কা শরিফের দিকে এমন ভাবে রওয়ানা হলেন যে ওনার সাথে কোনো সামান বা জিনিসপত্র ছিল না।উক্ত রাস্তায় এক গুহা পড়ে, ঐ গুহায় মাদার সাহেব অনেক সময় ধরে উনি এবাদত করেন।ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন,এরপর তিনি আবার চলতে লাগলেন।সিরিয়া থেকে আরব যাবার জন্য ইস্রাইল, ফিলিস্তিন, জর্ডনের উপর দিয়ে গিয়ে তিনি বায়তুলমুকাদ্দাস পৌছন।ওখানে বায়জীদ বোস্তামী উর্ফ তৈফুর শামীর সঙ্গে দেখা হয়।উনি বললেন, বদিউদ্দিন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি,তো এখানে এক নুর দেখছিলাম।তোমায় দেখে মনে হচ্ছে ও নুর তুমিই। জুলফিকারে বদী বই এর পৃঃ ২৫ তে হজরত খাজা নাসের উদ্দিন রঃ লিখেছেন, যখন সৈয়দ বদিউদ্দিন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছলেন এবং হজরত বায়জীদ বুস্তামীর রাঃ সঙ্গে মিলিত হয়,কামালতে কারামতে ওনার খুব নাম ছিল,ঐ সময় হজরতের ৩০০ খলিফা মুরিদ ,ঘোর তপস্যায় লীন ছিল।

।।হজরত বায়জীদ পাকের হাতে মুরিদ ।।

যখন মকবুল পরওয়ারদিগার আকা এ নামদার হজরত সৈয়দ বদিউদ্দিন জিন্দাশাহ মাদার রাজিঃ র প্রচার হল যে এখানে আর একজন আল্লা ওয়ালা এসেছেন,যিনি আপনার উদাহরন আপনি নিজেই। এই খবর শুনে হজরত বায়জীদ বোস্তামী রঃ আপনার এক খাস খাদিম দ্বারা ওনাকে ডেকে পাঠালেন। তখন ঐ খলিফা গিয়ে বললেন,আপনাকে বায়জীদ বোস্তামী উর্ফ তৈফুর শামী স্মরন করেছেন।খবর পাওয়া মাত্রই বদিউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে ওখনে পৌছলেন। বায়জীদ রাঃ ওনাকে দেখেই নিজের জায়গা থেকে উঠে মাথায় ও চোখে মুখে বোসা দিলেন,এবং বললেন,বদিউদ্দিন আমি এক স্বপ্ন দেখলাম, যে এক মজলিসে হুজুর সাঃ আমাকে আদেশ দিলেন, খুব শিঘ্রই এক ব্যক্তি তোমার নিকট আসবে যার নাম হবে আহমদ(বদীউদ্দিন)।তুমি তোমার নিজের পিরের থেকে যা কিছু আমানত পেয়েছো তা বদীউদ্দিনের আমানত,তুমি ওর আমানত দিয়ে দিয়ো।তারপর আমি আকায়ে দো আলমের আদেশানুসারে তোমাকে তোমার আমানত দিয়ে দিলাম। এখান হইতে মাদার সাহেবের সিলসিলা এ তৈফুরীয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তখন থেকে ওনার সিলসিলা - সিলসিলা এ তৈফুরীয়া মাদারীয়া নামে জনপ্রিয় হয়।

প্রসঙ্গ : হজরত মাদার সাহেবের সিলসিলার নামকরন তৈফুরীয়া মাদারীয়া হওয়ার কারন,মাদার সাহেবকে তৈফুর শামী ওনার নিজের খেরকা,পাগড়ী এবং সুফ পরিয়েছিলেন।আর নিজের খলিফা বানিয়েছিলেন।ফলে ঐ সিলসিলায় মুরিদ এবং খলিফা তৈরীর জন্য অনুমতি পায়।

মুরিদ ও খলিফার প্রসঙ্গ নিম্নরুপ

১/ সৈয়দ আহম্মদ জিন্দাশাহ মাদার -- হজরত তৈফুর শামী -- হজরত ইমাম জাফর সাদিক -- হজরত কাসিম -- হজরত সালমান ফারসী -- হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাঃ।

২।সৈয়দ আহম্মদ জিন্দাশাহ মাদার -- হজরত তৈফুর শামী -- শেখ এন উদ্দিন শামী -- হজরত খাজা আব্দুল্লাহ মক্কী আলমদার -- হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাঃ।

৩/ সৈয়দ আহম্মদ জিন্দাশাহ মাদার -- হজরত তৈফুর শামী -- হজরত ইমাম জাফর সাদিক -- হজরত ইমাম মহম্মদ বাকর -- হজরত ইমাম জয়নুল আবেদিন -- হজরত ইমাম হুসেন -- হজরত মোওলা আলী -- হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাঃ।

৪/ সৈয়দ আহম্মদ জিন্দাশাহ মাদার -- হজরত তৈফুর শামী -- সৈয়দনা হাসান বসরী -- হাবিবে আজমী-- হজরত সৈয়দনা আলী করমল্লা অজহু -- হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাঃ।

নোট : হজরত সুলতানুল আরেফিন বায়জীদ বোস্তামী রঃ র সম্মঙ্কে জোনেদ বোগদাদির বয়ান, উনি ওলীদের মধ্যে এমন স্থানে আছেন য, সমস্ত ফেরেস্তার মধ্যে জিবরিলের যেমন স্থান সর্বপরি । অর্থাৎ ফেরেস্তাদের মধ্যে যেমন সর্বচ্চ স্থানে আছেন জিবরিল আমিন তেমনি ওলীদের মধ্যে ওনার স্থান ও সবার উপরে।দ্বিতীয়ত সমস্ত সালেকিন দের রাস্তা যেখান তেকে শেষ হয়ে যায় সেখান থেকে বায়জীদ এর স্থান শুরু হয়।

সৈয়দ অলখের বয়ান : আঠারো হাজার সংসার বায়জীদের মধ্যে দেখতাম। বায়জীদ নয় অর্থাৎ বায়জীদের যে হয় সে সত্যের মধ্যে ডুবে আছে। অতপর হজরত মাদার সাহেব বায়জীদের নিকট মুরিদ হয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন এবং মক্কা পৌছে হজ্জ্ব আদায় করে ওখানে কিছুদিন রয়ে গেলেন। একদিন খানা এ কাবায় তওয়াফ করছিলেন, এমন সময় এক আওয়াজ শুনতে পেলেন,ওহে বদীউদ্দিন মদীনা পাক যাও, সেখানে তোমার দাদা মোহতরাম তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঐ শুনে উনি বেচেন ও পেরেশান হয়ে গেলেন।ইহা দূর করার জন্য শীঘ্রই বের হয়ে পড়লেন মদীনার উদ্দেশ্যে।যতই রাস্তা কমতে থাকে পেরেশানী ততই বেড়ে যায়।এই অবস্থায় অবশেষে মদীনায় পৌছলেন।

মদিনা মনোয়ারায় ওনার প্রথম হাজিরী:-

অপেক্ষার সময় শেষ হয় তার পর আপনি আকার দরবারে পৌছে যান ।যখন সালাম করে মাজারের নিকট উপস্থিত হন তখন মাজার হতে এক আওয়াজ এল,'আসসালামো আলায়কুম ইয়া ইন্নী অহলন ব সহলন ব মরহবা।উনি মাজারের মুকদ্দসে চুমা দেন এবং ওখানের ধুলি নিয়ে চোখে মুখে লাগান দরুদ পড়তে পড়তে সাতবার প্রদক্ষিন করেন । কিছু দিন পর দোজাহানের বাদশাহ সংসারের রচয়িতা পিয়ারা মহম্মদ(সঃ) হজরত আলীকে আদেশ দেন তোমার সুপুত্রকে তোমার মধ্যে যে শিক্ষা আছে তা দিয়ে ওকে তোমার মত করে শিখিয়ে দাও।আমি ওকে তোমার অধীনে ছেড়ে দিলাম।সুতরাং এর দীক্ষা তোমার মত করে সম্পূর্ণ করো।জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন,যে শেষ সময়ে বা অন্তিমকালে সমস্ত সিলসিলা শেষ হয়ে যাবে,কেবল এক সিলসিল হুসেনী মহদরিয়া মাদারীয়া থাকবে।মাদার সাহেব অনেক সিলসিলা পেয়েছিলেন।

জাফরিয়া মাদারিয়া,তৈয়ফুরিয়া মাদারিয়া সিদ্দীকিয়া মাদারিয়া এবং বসরিয়া মাদারিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন,যে ইমাম মেহদী(শেষ জামানার) কে প্রথম চিনবেন এই মহদরিয়া মাদারিয়ার লোক।

কিতাব সায়রুল মাদারের মায়ারিজুল বলায়ত এর কশফুন্নেমাত এ পাওয়া যায়,হজরত মাদার সাহেব উবৈসী ছিলেন।কেননা তিনি নিজের রুহানী শক্তি দ্বারা সরকারে দো আলম(সঃ)র দ্বারা শিক্ষা দিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন ।

সুতরাং যখন মাদার সাহেব কে হুজুর সাঃ হজরত আলীর কাছে ছেড়ে দিলেন ,তখন হজরত আলী ওনাকে প্রথমে পূর্ণরুপে শিক্ষিত করেছেন।তারপর আখেরীজমানার ইমাম মেহদীর নিকট কিছু জানার জন্য ছেড়ে দিলেন।এই ভাবে ইমাম মেহদীর আত্মার ও থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহন করেন।

সায়রুল মাদার কেতাবে লেখা আছে,যে চার আসমানী কেতাব নবীদের প্রতি পাঠানো হয়েছে ,যে চার আসমানী কেতাব জীনেদের প্রতি পাঠানো হয়েছে ,যে চার আসমানী কেতাব ফেরেস্তাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে - সব কেতাবের শিক্ষা মাদারসাহেব কে দেওয়া হয়েছে।সুতরাং সমস্ত ই ওনার মুখস্ত ছিল। ফেরেস্তাদের উপর যে কেতাব নাজিল করা হয়েছে তা নিম্নরুপ : ১.মিররত ২.ঐনুর্‌রব ৩.হর্‌মাজন ৪.মজহরে অলফ। এইভাবে জিনেদের উপর যে কেতাব নাজিল করা হয়েছে তা হল ১.রাকোরী ২.জাজরী ৩.সনারী এবং ৪.বোলয়ান।

মাদার সাহেব সব প্রকার শিক্ষা গ্রহন করার পর তপস্যায় বা ধ্যানে লীন হয়ে গেলেন।একদিন হুজুর সাঃ ওনাকে আদেশ করলেন, হে বদিউদ্দিন আহমদ, তুমি ভারত চলে যাও ওখানে তোমার খুব ই প্রয়োজন।এই শুনে উনি ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

আল্লার পছন্দীয় ধর্ম ইসলাম এবং নবী করিম সাঃ এর শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পৌছেদেবার জন্য তোমাকে সংসারে পাঠানো হয়েছে।ওনার ইচ্ছাই এই ছিল যে

আপনার আকা মওলার এই কলমা সামান্য হলেও মানুষের মধ্যে পৌছবেন। আজ নিজের লক্ষে পৌছনোর জন্য যাত্রা শুরু করছেন,এই দিনটা ৫৯৬ বৎসরের মধ্যে মাইল ফলক হয়ে থাকল।

নোট : এই যাত্রায় তিনি দিন ভোর রোজা রাখতেন আর সন্ধায় দুটি রুটি যা গমের আটা থেকে পাওয়া যায়,ওর একটি রুটি তিনি খেতেন এবং একটি দান করতেন আবার কখনো কখনো আট দশ দিন বাদে এক বা দুটি খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন।

ভারতে প্রথম এলেন

হজরত মাদার সাহেব মদিনা থেকে আরবের সমূদ্রের ধার দিয়ে য়ামন এলেন ওখানের বন্দর গাহ বা বন্দর জর্ডন থেকে জাহাজ চেপে ভারতের উদ্দেশ্যে আসছেন।যখন তিনি জাহাজে উঠলেন এবং জাহাজে যাত্রা শুরু করলেন তো তিনি দেখলেন জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, মানবতার অভাব এবং ওরা খোদাকে মানেও না, তখন ঐ যাত্রীদের একত্র করে ওদের দীন ইসলামের আদর্শ এবং শিক্ষার কথা জানাতে লাগলেন আরো জানালেন ইসলামের মধ্যে মানবতা এবং সহানুভূতির কত মূল্য দেওয়া হয় এই ভাবে উনি সর্ব প্রথম জাহাজের উপর ভাষন দ্বারা জাহাজের যাত্রীদের জাগানোর চেষ্টা করেন লোকদের বোঝান যে কেবল এক আল্লার ই এবাদত বা পূজা করা উচিত চন্দ্র সূর্য এবং সমূদ্র ইত্যাদি কে কখনো পূজা করা যায় না কারন ও গুলোকে আল্লাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর সব লোক ওনাকে গালমন্দ করে, এতে তিনি রেগে গেলেও সব কিছু সহ্য করে নিলেন কিন্তু খোদা তায়ালার এসব পছন্দ হল না এবং ঐ জাহাজ খোদার প্রকোপ থেকে রেহাই পেল না। এক বিশাল তুফান এল এবং জাহাজের মাঝিরা খুব চেষ্টা করে ও জাহাজকে রক্ষা করতে পারল না সব লোকই তুফানের বলী হল। জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেল সব লোক সমূদ্রে ডুবে গেল। কিন্তু খোদার খেলা কি মাদার সাহেব এক তক্তায় বসে বসে হিন্দ সাগর পার করার জন্য যাত্রা আরম্ভ করল। ওনার সঙ্গে সমুদ্রে আরো দু এক জন তক্তা ধরে ভাসতে থাকে তাদের ঐ অবস্থায় তিনি বলেন আমি নিশ্চয় ভারতে পৌছবো তোমরা যদি আমার অনুসরণ কর এবং এক আল্লার এবাদত কর তো তোমরা ও ভারতে পৌছবে। তারা ওনার কথায় না আসাতে ভুখা পিয়াসায় তড়পে তড়পে মরেছে কিন্তু হজরত মাদার সাহেব জীবিত ছিলেন যেখানে একজন সাথি কে ভূখা পিয়াসা মরতে দেখে তিনি খুব ব্যাকুল হয়েছিলেন। যেখানে দূর দূর পর্যন্ত কেউ কোথাও নেই সেখানে এক ব্যক্তি কেমন করে পানিতে সাঁতার দেয় তখন মাদার সাহেব নিজেকে আপন রবের উপর সঁপে দিয়ে এই প্রার্থনা করলেন হে আমার খোদা তোমার দোস্ত বা বন্ধুর আদেশানুসারে অচেনা লোকেদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম যাতে তোমার পূজার বা এবাদত এর জন্য লোকদের ইসলামের তারিকা প্রচার করতে পারি। এখন এই সমূদ্র বক্ষে আমার কোনো সহায়ক নেই তুমি ছাড়া, তো আমার ক্ষুধা পিয়াসার জন্য যা প্রয়োজন তার থেকে আমাকে মুক্ত করে দিন যাতে আমার ক্ষুধা এবং পিয়াসা না লাগে আমার যা

কিছু প্রয়োজন তা তুমি আজ থেকে সমাপ্ত করে দিন যাতে তোমার বন্ধু হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর লক্ষ্য জনে জনে সরল ও সাধারণ ভাবে পৌছতে পারি।

ঐ প্রার্থনা করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন কিছু পাখি উড়ছে দেখতে পান। যাতে তিনি বুঝতে পারেন শিগ্রই তিনি সমুদ্রের কিনারায় চলে আসছেন। আর কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি কিনারায় এসে পৌছলেন।

মাদার সাহেব ভারতের মাটিতে

যখন উনি কিনারায় পৌছলেন, তখন দেখলেন এক বুজর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন যার মুখমন্ডল থেকে নুরের ছটা বের হচ্ছিল তিনি স্বাগত জানানোর জন্য ওনাকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং ওনার নাম ধরে সালাম করলেন হজরত মাদার সাহেব ওনার সালামের জবাব দিলেন। এবং আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আপনাকে কখনো দেখিনা তবুও আপনি কেমন করে আমাকে জানলেন। তিনি (বুজর্গ ব্যক্তি) বললেন আপনাকে কে না জানে, কিছু সময় পরে সংসারের সমস্ত মানুষ আপনাকে জানতে পারবে। এরপর উক্ত অচেনা ব্যক্তি বললেন খাজা এ মা ইন্তিজারত মী কসদ্ অর্থাৎ আমাদের আকা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই কথা শুনেই তিনি তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষন চলার পর ছড়ির জঙ্গলে পৌছে গেলেন। যেখানে দেখলেন এক ভগ্ন কিলা রয়েছে। তিনি অনেক গুলি দরওয়াজা পার হয়েছেন সব দরজার পাহারাদাররা ছিল এক একজন ফেরেস্তার মত ছিল যাঁরা প্রত্যেকেই ১ম বুজর্গের মত ওনার নাম ধরে সালাম জানালো। সালামের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। পরে তিনি এক দালান দেখলেন যেখানে বড় সুন্দর ও আকর্ষিত তক্তা আছে। এবং পূরা দালান খুব সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ঐ তক্তে হুজুর (সাঃ) বসে ছিলেন যিনি ওনাকে দেখে হাসছিল। হজরত মাদার সাহেবকে হুজুর (সাঃ) আপনার পাশে বসার জন্য বললেন। আরো বললেন হে বদিউদ্দিন তোমার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছেন।এক এক ব্যক্তি এল যাদের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।তাদের মুখ থেকে নুরের জ্যোতি বের হচ্ছিল।তারা হাতে করে এক এক থাল নিয়ে এল যা নয় লোকমা খানা হুজুর (সাঃ) ওনাকে খাওয়ায়।উক্ত খানা বেহেস্তী খানা ছিল।এক এক লোকমা খানা খায় আর সংসারের সমস্ত কিছু ওনার সামনে ভেষে উঠছিল।এই ভাবে উক্ত নয় লোকমা খান, খাওয়ার পর আকাশ থেকে উপরে এবং পাতাল পর্যন্ত যা কিছু ছিল সব কিছু উনি দেখতে পাচ্ছিলেন।এরপর হুজুর সাঃ ওনাকে জান্নাতী কাপড় পরিয়েছেন এবং মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন হে আমার পুত্র তোমার কোনো দিনও ক্ষীদে বা পিপাসা লাগবে না।আর এই কাপড় কোনো দিন গন্ধ হবে না বা পুরানো ও হবে না।মুখের উপর হাত বোলানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে সূর্যের কিরণের মত জ্যোতি বের হয়ে চমকাতে লাগল।এমন কি ওই দিকে কেহ তাকাতে পারত না।এরপর আপনার তক্তা ওনাকে দিয়ে এই তক্তা তোমার বিভিন্ন দূর যাত্রার সহায়ক হবে।এই তক্তা তোমার ইচ্ছানুযায়ী উড়তে থাকবে।

নোট: উনি সমস্ত তবকের খবর জানতেন এজন্য মাদার সাহেবের শিলশিলা কে শিলশিলা-এ-তবকাতিয়া মাদারিয়া ও বলা যায়।

হাদিশ: শেখ শহাব উদ্দিন সুহরবরদী (রাদি)র কেতাব অবারিফুল মাআরিফ এর পৃষ্ঠা নং ৩১০ এ এক হাদিশ পাক লিখেছেন।হুজুর (সাঃ) ২০০বৎসর এর পরে একজন মানুষ সবার থেকে ভালো এবং খাফিফুল হাজ হবে।সব লোক নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন খাফিফুল হাজ কাকে বলে? তখন তিনি (সাঃ) বললেন যেব্যাক্তিরস্ত্রী বা পত্নী এবং সন্তান হবে না তাকে খাফিফুলহাজ বলে। কাশফুল মহজুব: কেতাবের ৫১৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে বুজর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তির একজন একা একা থাকতে পছন্দ করতো।ওনাদের সিদ্ধান্ত এই হাদিসের উপর যে হুজুর (সাঃ)বলেছেন খারুন্নাস-এ-ফী আখিরিজুমান -এ-খাফিফুল হাদ। অর্থাৎ অন্তকালে বা শেষ সময়ে সেই লোক সবার থেকে উত্তম যে খাফিফুল হাদ হবে আবার বললেন দেখো একা লোক সওকত নিয়ে যায়।অর্থাৎ ধর্মে জন্য যে লোকের বিবাহ হয় না সেই ব্যক্তি বিবাহিত ব্যক্তির থেকে অধিক ধার্মিক হয়।হজরত সৈয়দ বদিউদ্দিন (রাঃ) পুরো জীবন অবিবাহিত অবস্তায় কাটায়।হুজুর সাঃ যখন ওনাকে খানা খাওয়ায় ও বস্ত্র পরান তখন ওনার ফয়েজে প্রাপ্ত হয় তাকে মকামে সমাদিয়ত বলা হয় অর্থাৎ ওলিদের মধ্যে এমন এক মোকাম বা স্থান যার মর্যাদা বাস্তবিক রুপে কেবল মাত্র আল্লাহ এবং তার রসুলই জানে।তবুও এটা তো স্পষ্ট যে ঐ ধরনের ওলীর খানা খাওয়ার ও বস্ত্র পরির্বতন করার এবং বিয়ে করার কোনো প্রয়োজন হয় না।(এনাদের ঘুমের উপর ও অধিকার থাকে।) এনারা নিদ্রা নিয়ন্ত্রন ওকরতে পারে।

মকামে সমাদিয়ত যার থাকে তার ক্ষীদে ও ঘুম থাকে না এবং হয় কোনো প্রয়োজন তাকে পেরাশান করতে পারে না।ওনার কোনো প্রকার ভয় থাকে না এবং ওনার শরীরের উপর মাছি বসতে পারে না।মাটি ও সোনা তাঁর কাছে একই মূল্যের মনে হয়।পূরো সংসার কে ও এমন দেখে যে হাতের উপর এক সরষের দানা।উনি চাইলে বায়ুতে উড়তে পারে।চাইলে পৃথিবীতে চলতে পারে।চাইলে পানিতে এমন ভাবে চলে,যেমন শুষ্ক ভূমিতে চলে।কেননা হুজুর (সাঃ) আল্লার আদেশানুসারে ওনাকে খাইয়ে এবং বস্ত্র পরিধান করিয়ে মকান-এ-সমাদিয়ত দ্বারা সম্মানিত করেছেন।অতএব ওনার ঘুম ভুক পিয়াসা হাল্লাকী ইত্যাদি কোনো কিছু ছিল না।যখন চাইতেন তক্তাকে ইশারা করতেন এবং চলেযেতেন।।

হজরত গোলাম আলী বক্স বন্দী মুজদিদদী-র দুররুল মুআরিফ কেতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন একদিন মহফিলে কুতুবুল মাদারের আলোচনা হয় তাতে গোলাম আলী বক্স বন্দী বলেন আল্লাহ পাক সংসার কে কুতুবুল মাদারের অধিনে করে দিয়েছেন ভটকে হুয়ে লোক অর্থাৎ যে ইসলামী নিয়ম কানুন জানে না।ওই সব লোক কে সরল সঠিক পথের সন্ধান দেখান ঐ কুদুবুল মাদার। আরো বলেন হজরত বদীউদ্দিন কুদুবুল মাদার ছিলেন উচুঁ মোকামের উনি প্রার্থনা করেন হে রব আমার ভুখ ও পিপাসা না লাগে, বাস সেই থেকে পুরো জীবন কিছু খাননি এবং একই কাপড়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেন।ঐ রুপ হজরত আব্দুল হক মহদ্দিস দেহলবীর কেতাব আখবারুল আখিয়ার-এ লেখা আছে সেখ বদিউদ্দিন মাদার বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন অবস্থানে থাকতেন একেই মকামে সমাদিয়ত বলে।যা সংসারীর স্থান যাহা বারো বৎসর পর্যন্ত খানা খায় নি।যে বস্ত্র পরে ছিলেন তা ধোয়ার প্রয়োজন হয়নি।এবং মুখের উপর পর্দা ঢাকা দিয়ে থাকতেন অনেকেই বলে যে যে ওনার চেহারা মুবারক দেখতো সে সেজদায় পড়ে যেত।সরকার মাদার সাহেবের খানা না খাওয়া ও বস্ত্র না বদলানোর ব্যাপারটা বহু কেতাবে দেখা যায়।উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় ফুসুল, মসউদিয়া, তজকিরতুল, মুওকীন ইত্যাদি।

জীনেদের রাজার মুরিদ হওয়ার ঘটনা

ঐতিহাসিক গন লিখেছেন সরকার মাদার ভারতের বন্দর গাহ মালাবার যা খাম্বাত এর উপকূল ভাগে উপস্থিত আগেকার দিনে ওখানে ভারতের সমূদ্র বন্দর ছিল।মালাবার থেকে সরকার যখন আগে যেতে শুরু করল।তখন জিনেদের বাদশা ইমাদুল মূল্ক তক্তে করে ওনাকে আকাশে উড়তে দেখল।এবং কাছে এসে বলল (১) কত ভাল হতো আপনি যদি গোলামের উপর দয়া করতেন। (২) এই দুনিয়ার মহত ক্ষতিকর হয়। (৩) আল্লাহ জয়ীর উপর জয়ী। (৪) আল্লার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ বহুত রহমত করনে ওয়ালা। (৫) তুমি নফসের সাথে বিরোধীতা করো এবং আল্লার উপর হেজগারী করো।

এই কথার্বাতার প্রভাব ইমাদুল মুল্ক এর উপর এমন ভাবে পড়ে যে নিজের রাজ্য পাঠ সব আপন কন্যা দিয়ে হুজুরের গুলামী করতে থাকে।কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন ও সরকারের হাতে মুসলমান হয়ে ছিল।

নোট: কাল্পীর সিরাজুদ্দিনের ঘটনার সময় ইমাদুল মুল্ক ওনার দয়োয়ান ছিল এবং ওনার ইশারাতেই দরওয়াজা উচুঁ হয়ে ছিল।তথাপি সরকার ইমাদুল মুল্ককে নিজের খলিফা বানিয়ে ছিলেন।তিনি সরকারের সাথে সাথে থাকতেন এবং দারোয়ানের কাজ করতেন।যে সময় সরকার ভারতে এসেছিলেন তো মালবার (খাম্বাত) এর বন্দর গাহে উঠে ওই শহরের গৌরবের কথা যতই বলা যায় না কেন তা কম হয়।কেন না হিজরী ২৪২সনে তথা ৮৭১ইং তে যখন সরকার এখানে এলেন ওনার হেদায়েতে ভারত কি পূরো সংসারে লাভান্বিত হয়েছিল সুফি এবং সাধকের বৃদ্ধি হয়ে ছিল সংসারকে ইসলামের রশ্মিতে প্রকাশিত করেছেন।সরকার আসার আগে ভারতে চার বা সাড়ে চার হাজার বৎসর আগে অত্যাচার হিংসার তান্ডব বাজিয়ে এখানে দয়া মায়া মানবিতার এবং অহিংসার বাতাবরন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।এখানের লোক সূর্য,অগ্নি,চন্দ্র ইত্যাদির পূজা করতো এর পর ৫২৭খ্রীঃ মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর জৈন নিজের ধর্ম প্রচার করেন। গৌতম বুদ্ধ ও শাসক পরিবারে ছিলেন।এবং ইনার দেহান্ত ৭৮৩খ্রীঃ হয়।ওহা খ্রীষ্ট ভারতের মৌর্য্য বংশের স্থাপিত হয়, যাহা ১৫০খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল।কেন না চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামক শুদ্র স্ত্রীর পুত্র ছিল। এই কারনে একে মৌর্য্য বলে।এই বংশের মহান শাসক অশোক বর্দ্ধন এর সময়ে প্রজাদের বড়

সুবিধা এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল।এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার জোর হয়েছিল।কেন না সম্রাট অশোক স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল সুতরাং সম্রাট প্রতিবেশী রাজ্যের কাছে উক্ত ধর্মের প্রচার করেন বলে জন সাধারণ উক্ত ধর্ম গ্রহন করেছিল। ৭০০ বৎসর পর্যন্ত ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৌদ্ধ ধর্ম সাধারণ ধর্মরুপে ছিল যাকে হিউয়েন সাঙ ১৫বৎসর ভারত সফরে বড় গৌরবের সাথে ব্যাক্ত করেছেন উনি ভারতে ৬৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ১৫ বৎসর ছিল এবং ভারতের বড় বড় ভু ভাগ ঘুরেছেন। উনি লিখেছেন, ভারত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ঐ সময় মুখ্য ধর্ম ছিল বৌদ্ধ,হিন্দু ধর্মের ও কোনো বিশেষ মহত্ব ছিল না।ঐ সময় মক্কায় হুজুর (সাঃ) নিজের নবুয়ত প্রাপ্তির কথা প্রচার করেছিলেন।

আরব এবং ভারতের মধ্যে ব্যাবসায়িক প্রদানের কারনে ভারতের ইসলামের ঘোষনা বাণী পৌছে ছিল। চাঁদ টুকরো হওয়ার ঘটনায় কিছু আরবের ব্যবসায়ী ভারতে তার প্রমান পায় ফলে কিছু ভারতীয় মুসলমান হয়ে যায়।

মুহম্মদ বিন কাসিম এর পূর্বে কিছু সাহাবী হজরত, যেমন খুমৈর বিন রবী রজি: ভারতে এসেছিলেন। ৯৩ হিজরী (৭১২খ্রীঃ) তে মুসলমানদের জলযান বা জাহাজ কে সিন্ধু ডাকাতরা লুঠ করে। এতে রাজা দাহিরে কিছু সাহায্য না করায় মুসলমানরা ভারতকে আক্রমন করে সিন্ধু বিজয় করে। এই সময় মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা পর্তুগাল স্পেন রোডস দ্বীপ আফ্রিকা মহাদ্বীপ সাম ফিলিস্তিন আরব ইয়ামন ইরান কাবুল কন্ধাহার রুস তুর্কী এবং চীন ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল। অথচ ভারতের ব্যাপারে কেউ চিন্তা ভাবনা তেমন করেনি কিন্তু জাহাজ লুঠ হয়ে যাবার পর হজাজ বিন ইউসুফ মহম্মদ বিন কাশেম কে নেতৃত্ব দেয় মুসলিম সেনা ভারতকে আক্রমনের জন্য নির্দেশ দেয়।এবং বিজয় প্রাপ্ত হয় আর এইরুপ বুজোর্গের (জ্ঞানী ব্যাক্তি) মধ্যে শাহ মাদারের নাম উপরে কেন না উনিই সেই বুজুর্গ যিনি সর্ব প্রথম ভারতে আসেন।যে সময় উনি হিন্দুস্থানে এসেছিলেন তখন এখানে অত্যাধিক দেব দেবীর ইত্যাদির পূজা হতো পরিস্থিতি এমন ছিল যে সবথেকে যত বড় যাদুগর হবে সে সব থেকে বড় দেবতা মানা হবে। যে ব্যক্তি আসন্ন পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বন্ধ করে যত বেশি সময় দম বন্ধ করে থাকতে পারবে তাকে তত বড় গুরু মানা হবে। কেন না ভারতে এই ভাবে মুনি ঋষীরপদ মর্যাদা বা সম্মান বিচার করা হত। অতপর সরকার মাদার সাহেব ইসলামের প্রচারের জন্য এক অচেনা রুপে এবাদত করা শুরু করল, যাকে 'হবস দম বলে। তিনি স্বয়ং তো করতেন এমন কি তার শিষ্য বর্গ কে ও হবস দমের শিক্ষার আদেশ দেন এই ভাবে ওনার সাথীরাও চোখ বন্ধ করে এমন লীন হয়ে যেতো যে ছ-ছ মাস পর্যন্ত শ্বাস নিতে হত না। প্রথম শ্বাস লা ইলাহা-ইল্লালাহা নিতেন তো হয় শ্বাস মহাম্মাদার রসুলুল্লাহ নিতেন। এমন কি মুখের উপর (চেহারায়) অনেক গুলো পর্দা পড়ে থাকতো। খাদ্য এবং বস্ত্রাদীর প্রয়োজন হত না।অতপর ওনার (মাদার সাহেবের প্যাশে) ভীড় লেগে যেতো। যখন চোখ মেলতো তো লোকের দূঃখ,কষ্ট ও অসুখ বিসুখ দূর করে দিত। নি-সন্তান লোক কে সন্তান রত্ন মিলতো,উনি যার যে জন্য দোয়া করতো তা কবুল হয়ে যেতো। তখন লোক সুখী ছিল, অতপর ওনার প্রতি

লোকের বিশ্বাস বাড়তে লাগল এবং সব লোক ওনার আদেশ মানার জন্য তৈরী ছিল । উনি জনতা কে ইসলামের আদর্শ-শিক্ষার ব্যাপারে জানাতো তথা সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষকে বোঝালেন ফলে ইসলামের প্রসার খুব জোর চলতে লাগলো, পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেওয়া শুরু হল ।

অন্ধ চক্ষু ফিরে পায়

খাম্বাত থেকে উনি (মাদার সাহেব) সুরত এলেন, সুরতে তখন খুব সুখ ও শান্তি ছিল চারিদিকে সবুজ চাষে ভরা ছিল। শীতল বায়ুতে ফুলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, লোক তো মাদার সাহেবের আলোচনা শুনে ছিল এখন ওনাকে দেখার সুযোগ ও মিল গেল আবার খাম্বাত থেকেও অধিক ভিড় হতে লাগল, এবং নিজ নিজ মনস্কামনা বা মানত পূরণ করতে থাকে। শহরে এসে পৌছতেই ওনার সঙ্গে এক অন্ধ ভিক্ষারীর দেখা হয়। যে লোকের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল মাদার সাহেব অজু করলেন এবং যে পানি বেচে ছিল তা নিয়ে ঐ অন্ধের চোখে ঘষে দিলেন ফলে ওই অন্ধের চোখে চমক এসে গেল এবং সংসারের রঙিন ছবি দেখতে লাগলো। লোক সব খুশিতে ভরে গেল এবং ওনার বলে দেওয়া পথে বা নির্দেশিত পথে চলতে থাকে এবং ইসলাম ধর্ম কবুল করা শুরু করল।

শেখ মহম্মদ লহোরীর হজ্জ

হজরত মাদার সাহেব ভারত থেকে কয়েকবার হজে যাওয়ার জন্য বের হয় বিভিন্ন রাজ্য দেশ ঘুরে আবার ভারতে চলে আসতেন, যখন তিনি সুরতে একবার আবার এলেন এবং দূর দূর পর্যন্ত ওনার আলোচনা চলতে থাকে

ঐ সময় হজরত শেখ মুহম্মদ লাহোরী হজের জন্য যাচ্ছিলেন।যখন উনি হজরত মাদার সম্বন্ধে শুনলো তো সঙ্গে সঙ্গে দেখা করার জন্য চলে এলেন। সেখ লাহোরী মাদার সাহেবের মুখের দিকে চেয়েই রইলেন যদিও ওনার মুখে পর্দা ঢাকা ছিল, তবুও নুরের জ্যোতি এমন বের হচ্ছিল পর্দার উপর দিয়েও পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। ঐ বিলায়েতের রশ্মি দেখে প্রেমিক পতঙ্গের ভীড় উপচে পড়ছিল। লোক নিজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঝোলা ভরছিল। এবং দয়ালু মাদার বাবার গীত গায়ছিল।শেখ মুহম্মদ লাহোরী গুরুজীর সেবায় থেকে ভুলেই গেলেন। যে সে হজ্ব করতে বের হয়েছিল। শেখ মুহম্মদ লাহোরীকে নিজের সিলসিলায় মুরিদ এবং খলিফা বানানোর জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ঐ রহমতে নুরের বর্ষায় মগ্ন হয়ে ভিজতে থাকে। হঠ্যাৎ মনে পড়ল যে উনি ঘর থেকে হজ্ব করতে বের হয়েছিল। কিন্তু এখন হজ্জের সময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এত অল্প সময়ে সুরত থেকে মক্কা পৌছানো সম্ভব নয়। এই চিন্তা করে সে অস্থির হয়ে গেলো। দিন দুখীকে দয়ার দানী দয়াল দৃষ্টিতে দেখেন এবং মিষ্টি ভাষায় তাকে বলল মুহম্মদ লাহোরী এত চিন্তা কিসের বাবা এত অস্থির কেন? কি হজ্জ করতে পারনি বলে মনে এত দুঃখ? মনে দুঃখ করোনা তুমি আমাকে তওয়াফ বা প্রদক্ষিন কর। তোমার হজ্জ হয়ে যাবে। শেখ মুহম্মদ লাহোরী

গুরুজীর আদেশ পেয়েই খুশি খুশিতেই মাদার সাহেব কে তওয়াফ বা প্রদক্ষিন করতে শুরু করে দিলো। ঐ সময় উনি (লাহোরী) দেখলেন যে গুরু মহারাজ নেই বরং যা আমি তওয়াফ করছি তা হল পবিত্র কাবা। যখন তওয়াফ বা প্রদক্ষিন শেষ হল তখন দেখল গুরুজীর সেবাতেই উপস্থিত আছে। কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন চিন্তা করছিল যে, আল্লাহ জানে আমার হজ্জ হল কি না হল, এই চিন্তাই সে পেরেশান হল কিন্তু গুরুজীর নিকট ঐ ভেদ ও খুলে গেল, মাদার সাহেব বাবা লাহোরী কে ডেকে নিজের পাশে বসালেন। এবং নিজের হাত ওনার (লাহোরীর) চোখের উপর রাখলেন, তখন সেখ মহম্মদ লাহোরী দেখলেন খানা-এ-কাবাতে উপস্থিত, হজরত মাদার সাহেব বললেন, হজ্জের সমস্ত নিয়ম গুলো পুরো করে নাও। আদেশানুসারে সেখ মহম্মদ লাহোরী হজ্জ এবং জিয়ারতের সব কিছু নিয়ম কানুন পুরো করে নিলেন। পাঁচ মাস আরবে থাকেন। এরপর আবার দেখেন গুরু মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত আছেন। যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসেন সেখানে যাদের সঙ্গে লাহোরী দেখা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে এখানে দেখা হয় তখন সেখ মহম্মদ লাহোরী বিশ্বাস হল যে তার হাজিরী মদিনায় পাকে কবুল হয়েছে।

শহর সুরতে উপস্থিতি

আল্লা ওয়ালার নুরানী কাফেলা সুরতে উপস্থিত ছিল। আর যেখানে মাদার সাহেবের স্থান হয় সেখানে হাজার হাজার মানুষ তার সেবায় উপস্থিত থাকে। নাগরিকরা আগতদের স্বাগত জানাচ্ছে। এই মুসলমানদের প্রেম ভালোবাসা ব্যবহারের জন্য মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে ওনার কাছাকাছি আসতে থাকলো, আবার নামাজ পড়ার মধ্যে ও মানুষ দেখলো এক জনের নেতৃত্বে সবায় চলছে। নামাজ পড়ার মাধ্যমে তপস্যা। সাধারন মানুষ তাই দেখতে ভীড় লেগে যেতো। মাদার বাবা নিজের মুখের পর্দা যখন তুলতেন তখন বহু মানুষ বেহুস হয়ে যেতো আবার যখন হুস হত তখন কলমা লা-ইলাহা ইল্লাহ মোহম্মদার রসুল উল্লাহ পড়ে মুসলমান হয়ে যেতো (বহু লোক এই ভাবে মুসলমান হয়েছে।) এই দিন গুলো সুরতের খুব ভালো অবস্থা ছিল। এমন লাগছিল যে প্রতি ঘরে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে,যাতে মাদার সাহেব উপস্থিত আছেন এবং যেন খুশির মেলা এসে গেছে।লোক দৌড়ে ছুটে ওনার কাছে আসতে লাগল।

নিঃসন্তান সন্তানের জন্য বিমার লোক রোগ মুক্তির জন্য কেউ দুঃখী সে সুখের খোঁজে সরকার মাদারুল আলমীনের আশ্রমে হাজির হয়।সরকার যার জন্য দুয়া করতেন তার মনোস্কামনা পুরো হয়ে যেতো। এই ভাবে হাজার লোকের ইচ্ছা পূরন হয়। হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়েছে। সুরতে তিনি তিন জায়গায় আস্তানা নিয়েছিলেন। ঐ জায়গা গুলো মাদারের চিল্লা নামে আজো পরিচিত। একদিন মুহুর্তের মধ্যে এ সংবাদ চারিদকে প্রচার হল যে, সৈয়দ বদীউদ্দিন কুতুবুল মাদার (রাঃ) এই শহর ছেড়ে চলে যাবেন। তো লোক এতে এমন দুঃখী হয়েছিলেন যে যেন ওদের পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে। সময়ের গতি থেমে গেলো দিবানাদের কাছে এটা একটা আলাদা রুপ ছিলো। কয়েক দিনই মহারাজের সেবায় নিয়োজিত ছিলো।কিন্তু ওদের মনে হচ্ছিল হুজুর সবে মাত্র এসেছেন। হুজুর এমন তাড়াতাড়ি চলে যাবেন

এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে এসে বলতে থাকে হুজুর আমার যা ভুল বা অন্যায় হয়েছে তা ক্ষমা করে দিন বা যা শাস্তি দিলে হয় দিন কিন্তু আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আমাদের আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত করবেন না। সরকার মাদার বললেন, আমি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারবো না। তোমরা চিন্তা করো না, বাইরে থেকেও তোমাদের উপকার আমি অবশ্যই করতে থাকবো।আমি আবার শিঘ্রই আবার এই শহরে আসব। কেন না আমাকে ভারতের প্রত্যেক শহরে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমার কয়েক জন সাথীকে ছেড়ে যাচ্ছি যারা তোমাদের শিক্ষা দিতে থাকবে। এবং তোমাদের মনের ইচ্ছা পুরো করতে থাকবে। এবং খুব মন দিয়ে শুনো যা কিছু আমি তোমাদের শিখিয়েছি সব ইসলামের শিক্ষা সর্ব মনে রেখো এবং কোরানের বাণী মতো চলবে। দীন ইসলাম কে কখনো ছেড়ো না। ঐ ধর্ম যা আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি তা আমি পেয়েছি হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর নিকট হইতে এ ধর্ম আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম। ইসলামে এই প্রকারের বহু বাণী তিনি রেখে গেলেন।

হুজুর খাম্বাতে

আবার তিনি সুরত থেকে খাম্বাত পৌছালেন। এখানে এক চিল্লা করলেন যাহাতে কেবল শিক্ষা এবং অহিংসা সম্বন্ধে এমন সদ্য প্রদীপ জ্বালালেন যাহা চির কালিন মশাল রুপে থেকে গেলো। এখান কার রাজা জসবন্ত সিংহ মাদার সাহেবের কাছে প্রভাবিত হয়ে ওনার কাছে এলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন সরকার ওনার নাম রাখলেন, জাফর খাঁ। জসবন্ত সিংহ মুসলমান হওয়ার পর অনেক মসজিদ নির্মান করেছেন। পরবর্তী কালে জাফর খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হয় আবার তিনি অনেক গ্রাম শহর পার করে ভড়োচ পৌছয়।

জিন্দাশাহ মাদার ভড়োচে

ভড়োচে মাদার সাহেবের চমৎকার ও আর্দশে প্রভাবিত হয়ে এক সাথে৩৬০০ জন মুসলমান হয়। হজরত মাদার সাহেব যখন কোনো নতুন জায়গায় যেতেন সেখানে কিছু মুরিদান বা শিষ্য রেখে যেতেন নতুন মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা দেবার জন্য। ভড়োচের জনতার সাথে সাথে ওখানের রাজাও হজরতের অপেক্ষা করতে থাকে অর্থাৎ ওখানকার রাজাও একজন প্রার্থী যিনি হুজুর কে বলেন একবার গিয়ে ঐ মাটিকে যেন ধন্য করে দেয়। এমন কি কৃষি জমিও কৃষির উৎকৃষ্ট জমিতে পরিনত হয়। লোক খুশি খুশিতে ও উদার ভাবনায় ছিল। হজরত লোককে সমস্ত প্রকার ভাল সুবিধা এবং উন্নতির শিক্ষা দিতেন। লোক ওনার কাছে যে যার নিজের নিজের দূঃখ কষ্টের কথা শোনাতেন সরকার সব লোকের জন্য আশির্বাদের দৌলত লুটিয়ে দিতেন,এবং নিজের খোদার নিকট সব লোকের ভালাই এর জন্য ও ইসলামের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করতেন। লোকের মধ্যে খুশির ঝড় বইতে লাগলো। কারো চোখে রোশনী এলো। তো কেউ সন্তান পেল, তো কারো কারো দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেলো,তো কারো দূঃখ সমাপ্ত হয়ে গেল। ফলে হজরতের আলোচনা যে কোনো

না যে কোনো ব্যাপারে অবশ্যই হতে থাকলো। এখানে মাদার সাহেবের অনেক গুলো চিল্লা করেছেন, যা এখনো ওখানে গেলে দেখা যায় এরপর ইনি পাদরার উদ্দেশ্যে চললেন। এখানেও মাদার সাহেবের আলোচনা সাধারন মানুষের মুখে মুখে আজো আছে, এ সেই মনিষী বা বুজর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি নিজের মুখের উপর সর্বদা পর্দা দিয়ে থাকতেন। কিন্তু মুখের উজ্জ্বলতা ঐ পর্দায় ঢাকা থাকতো না। যে ওনার চেহারা মোবারক এক দৃষ্টে দেখতো তো সে সোজা সেজদায় লুটিয়ে পড়তো। এবং যখন হুস হতো সে কলমায় লা-এলাহা-ইল্লালা মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ পড়ে নিতো। লোকের মধ্যে ইসলামের প্রতি আকর্ষন বাড়তে থাকলো এবং বেশ কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবার পর মাদার সাহেব আবার খাম্বাতের দিকে এলেন।

২-হজ্জের জন্য যাত্রা

আবার তিনি হজ্জের জন্য পানির পথে আরব পৌছয়। আর হজ্জ আদায় করলেন। এরপর কাবা শরীফে বক্তৃতা দেন, যে ভারত এমন এক দেশ যেখানে মানুষ খুব ভদ্র এবং সভ্য, ওদের ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই বক্তৃতার প্রভাবে মাদার সাহেবের সাথ দিল প্রচুর লোক, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে ছিল। এবার তিনি ইরাক পৌছলেন যেখানে তিনি ইসলামের ঝান্ডা উঁচু করেছিলেন। ইরাকের বিভিন্ন শহর ঘুরে এবং মানুষের মুরাদ (ইচ্ছা) পুরন করতে করতে তিনি বাগদাদ পৌছলেন। এবং কিছু দিন ওখানে থেকে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিতরন করেন এরপর বুখারায় আসেন। ওনার সব সময়ের সাথে থাকতেন সৈয়দ তাহির নামক মহান সুফি এবং খাদ্য হিসাবে খেতেন মাত্র একটি (ভাত) ওনাকে মাদার সাহেব বললেন, খুব শিঘ্রই এখানের কুতুব মারা যাবেন, যদি তুমি চাও তো তোমাকে এখানের কুতুব বানিয়ে দেবো। সৈয়দ তাহির মিনতী করে বললেন আমাকে পূরা সংসারের কুতুব বানানো হলেও যদি আপনাকে ছেড়ে থাকতে হয় তবে আমি ঐ পদ কখনোই নেব না। আমি আপনাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবো না। যদিও তিনি মাত্র এক দানা ভাত খেত তবুও সরকার তাকে বলতো তোমার মুখের ভোজনের গন্ধ কতদিন সহ্য করবো। এই কথা শুনে তিনি খানা খাওয়া ও ছেড়ে দিয়েছিলেন

কুতুবুল মাদার ইস্রাইলের জঙ্গলে।

কাশফুল মহজুবের পৃষ্ঠা নং ৩২৬-এ দাতাগঞ্জ বক্স লাহোরী লিখেছেন, হজরত আবু বক্স বররাক বলেন, একদিন হাকিম তিরমিজি আমাকে বললেন হে আবু বক্স আমি আজ তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাব, আমি বললাম হুজুরের আদেশ আমার শিরোধার্য। এবং আমি ওনার পিছনে পিছনে চলতে থাকলাম। কিছুক্ষন পর আমি এক ঘন জঙ্গলে এসে পড়লাম। সেখানে দেখলাম এক সবুজ মোটা গাছের নিচে একজন ব্যক্তি সুন্দর পোশাক পরে এক তক্তে বসে আছেন। পাশেই জল প্রপাত ছিল। যখন হাকিম তিরমিজি ওনার পাশে পৌছলেন, তখন কিছুক্ষন পরে ওখানে আরো প্রায় চল্লিশ জন পৌছলেন। তক্তে বসা ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি

আকাশের দিকে নিজের আঙ্গুলের ইশারা করলেন তো উপর থেকে খানা এলো যা সবায় খেল। হাকিম কিছু প্রশ্ন করলো তো বুজর্গ ব্যক্তি ব্যাখাত্মক উত্তর দিলেন যা আমার কোনো বোধগম্য হয় নাই আবার কিছু সময় পরে আসার জন্য নির্দেশ নিয়ে আমরা চলে এলাম কিছু সময় পরে তিরমিজি আবার এলেন তো আমি জিঞ্জাসা করলাম উনি কে ছিলেন। এবং উনি বললেন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন হজরত কুতুবে মাদার আর ঐ জায়গা ইস্রাইলের ঘন জঙ্গল।

মাদার সাহেব শাম মুলুখে

হজরত মাদার সাহেব ইসলামের প্রচার করতে করতে শাম মুলুখে (সিরিয়ায়) পৌছয় এবং বিভিন্ন শহর গ্রাম ঘুরে শহর হলবে এলেন। এবং নিজের ঘরের পরিবারের আপন জনেদের সাথে কিছু দিন কাটালেন এবং কিছুদিন পর পুনারায় ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। শেখ শাহ জাফর কুদস্ সিরহু একবার বারো বৎসর তপস্যা করেন এমন অবস্থা হয়েছিল যে মাটি থেকে বারো বৎসর তাঁর গায়ে সবুজ গাছ ফুটে গিয়েছিল। সমস্ত ঠান্ডা গর্মী আর বর্ষা উক্ত বুজুর্গের উপর এমন ভাবে কেটে যায় কিন্তু ও আল্লার নামে স্মরনে এমন ভাবে ডুবে ছিল যে, ওনার সব কিছুই মনে হয় না। আর যখন তপস্যা শেষ হয় তিনি সোজা মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত হয়। মাদার সাহেব খুব পিয়ার এবং প্রেম ভাবনায় তাকে পাশে বসায় এবং ওনার সাহস বাড়ায় এবং তার উপর দয়ার রহমত বর্ষায়।

মাদার সাহেবের মধ্যে এমন একটা জিনিষ ছিল যে যদি কেহ ঘোর তপস্যা করে আসতো তো তার সাথে এমন ব্যবহার করতেন মুহুর্তের মধ্যে সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যেত।

শাহে তাবকাত অহমদাবাদ এর মাটিতে:-

হজরত মাদার সাহেব ভারতে এসে বহু গ্রাম এবং শহরে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা এবং আর্দশ লোককে জানালেন আবার ফের গুজরাট পৌছলেন। গুজরাটের শহর আমেদাবাদে যে স্থানে তিনি বসেছিলেন ওখানে আজো প্রমান হিসাবে কিছু জিনিষ পাওয়া যায়। কেন না ভারতে ধীরে ধীরে মাদার সাহেব প্রসিদ্ধ হয়। এই জন্য তিনি যেখানে যেতেন সেখানের লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। হজরত শামসুদ্দিন হুসেন আরবীর বয়ান যখন মাদার সাহেব আহমেদাবাদ পৌছলেন তো শিঘ্রই লোকের ভীড়ে সেখানে ভরে যেতে শুরু করল। এই ভীড় প্রতিদিন বাড়তে থাকলো।মাদার সাহেবের আসার খবর শুনে লোক ওনার সেবায় উপস্থিত হতে লাগল, এবং ওনার দোয়া ও আশির্বাদে ধন্য হতে থাকলো। লোকের মধ্যে তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বা তৈরী করতে সময় সময় ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে এমন অবস্থা করতেন যেন লোক সহজে ইসলাম কবুল করে। মীর সামসুদ্দিন বলেন, কয়েক দিনের মধ্যে ওখানে ৩৬০০ ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল, যাহারা হুজুরের আদেশ অনুসারে মসজিদ কুয়া এবং শিক্ষন সংস্থান স্থাপন করেছিল।

ওখানকার রাজা বলবান সিংহ ওনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন যা শুনেছিল তার থেকে অনেক বেশী পেলেন। ব্যস ওনার আদর্শের নিকট হেরে গেলেন বলবান সিংহ শিঘ্রই ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন। সরকার ওনার নাম রেখেছিলেন জোর আবর এবং আদেশ দিলেন কিছু মসজিদ এবং কুয়া নির্মান করাও। রাজা জোর আবর অনেক মসজিদ এবং কুয়া নির্মান করেছিলেন। পালং পুরে ওনার আসার বিশেষ চিহ্ন দেখা যায়। যাহা হল মাদারের চিল্লা এবং জোর আবর প্যালেস।

ওলিদের মহারাজা খাম্বাতে

গুজরাটের কিছু শহর ঘুরে তিনি আবার খাম্বাতে পৌছলেন। ওখানের রাজা জসবন্ত সিংহ সরকারের সেবায় উপস্থিত হয়। ওনার উপর এমন প্রভাব পড়ল যে উনি মাঝে মাঝে সরকারের সেবায় চলে আসত। এমনই একদিন উনি সরকারের নিকট আরজ করলেন যে আমাকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দিন এবং আপনার চরনে ঠাই দিন। সরকার রাজা জসবন্ত সিংহ কে মুসলমান করে নিলেন। রাজার সাথে বহু প্রজাও মুসলমান হয়ে ছিল। রাজার নাম সরকার রাখলেন জাফর খাঁ। এরপর তিনি আবার হজ্জ ব্রত পালন করার জন্য দ্বিতীয় বার মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন পৌছলেন তখন কিছু দিন পরেই হজ্জের সময় এসে গিয়েছিল। তিনি হজ্জ আদায় করলেন। এরপর তিনি মদিনায় পৌছে নবীজির উদ্দেশ্যে সালাম পেস করে ইরাক এলেন, এখানে নজফ-এ-আস্রাফ, কারবালা হয়ে বাগদাদ এলেন।

বাগদাদে বড় পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত

এই সময় সৈয়দনা গৌস পাক বিলায়েতের মঞ্জিল সম্পূর্ন করছিল। তখন ওনার মধ্যে জালালিয়াত ছিল, যদি কোনো উড়ন্ত পাখির দিকে তাকাতো তো ঐ পাখি জ্বলে যেতো কোনো মানুষ ওনার সামনে টিকতে পারতো না। কিন্তু যখন সৈয়দ বদিউদ্দিন মাদার সাহেব ওনার এই অবস্থা দেখে ওনার পাশে পৌছে বললেন-এই মেরে ভাই আমাদের দাদা মহাতরাম রহমতাল্লিল্ আলামিন তখনই ওনার সমস্ত জালালিয়ত নষ্ট হয়ে যায় এবং জালালিয়তে পরির্বতন হয়ে সব শীতল হয়ে যায়। এবং চোখের গরম সব শেষ হয়ে গেল। সৈয়দনা গৌস পাক (রাঃ) হুজুর মাদার পাক এর এ প্রথম সাক্ষাত এরপর তিনি বদখস্থান গেলেন।

বদখস্থানে সরকার

বদখস্থানে সরকার এক জায়গায় এতেকাফে ছিলেন। নামাজের সময় যখন আল্লাহ্ আকবর তকবীর দেন তো তখন মৌলানা হুসৌন এবং ওনার সাথীরা বেহুস হয়ে যায়। যখন ওরা হুঁস ফিরে পায় তখন মৌলানা হুসৌন তার সাথীদের নিয়ে সরকারের কাছে এলেন, তিনি ওনাদের মুরীদ করলেন। খলিফা ও তৈরী করে দিলেন। হজরত ফজলুল্লাহ বদখস্থানী কে ও মুরীদ এবং খলিফা বানালেন। মৌঃ

হুসৌন ও ফজলুল্লাহ বড়ো কারামতী ও চমৎকারী বুজর্গ ছিলেন। লোকেরা ওনাদের থেকে বহু ফয়েজে মাদার (মাদার সাহেবের দোয়া পায়। বদখাস্থানের পর মিশরের উদ্দেশ্যে চললেন।

হুজুর মাদার পাক মিশ্র বা মিশরের উদ্দেশ্যে চললেন।

মিশর দেশের অচেনা জায়গার শহর ও গ্রামে মাদার সাহেব বেশ জোর দিয়ে ইসলাম প্রচার করলেন।হাজার হাজার লোক কে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে অন্ধকার ময় জগৎ থেকে আলোর পথ দেখান।স্থানে স্থানে মাদ্রাসা এবং মসজীদ নির্মান করে পৃথিবীতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

একবার মিশর দেশের এক প্রশিদ্ধ হাকিম আহমদ মিস্রী নদীতে গোসল করছিলেন। ওনার এক শিষ্য কে বললেন এখনি এক বিষাক্ত হাওয়া বইবে এবং বায়ু দুষিত হয়ে যাবে, এখনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ।এরপর ঐ হাকিম সাহেব নদী থেকে উঠে পড়লেন।তখন থেকে এমন বিষাক্ত বায়ু চলে যে সমস্ত শহরে রোগ ছড়িয়ে পড়ে।হাকিম সাহেব রোগিদের চিকিৎশা পুরোদমে চালিয়ে গেল।কিন্তু আল্লার মরজি রোগ দুর করতে পারল না।এমন সময় ঐ শহরের উপর দিয়ে মাদার সাহেব যাচ্ছিলেন,তিনি হাকিম সাহেব কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হাকিম আহমদ তুমি খোদার গজব কে দূর করতে পার না। এটা খোদার আজাব, শহরবাসী যতক্ষন না এতিম বাচ্চাদের মাল ফিরে দেবে ততক্ষন ঐ রোগ দূর হবে না।এই কথা শুনে হাকিম আহমদ মিশরী মাদার সাহেবের নিকট মুরিদ হল।এমন কি বহু শহরবাসী ও ওনার মুরিদ হল।ওরা নিজ নিজ কর্মকান্ডের জন্য লজ্জিত হল এবং ক্ষমা প্রার্থি হল ও এতিম বাচ্চাদের মাল ফিরিয়ে দিল।এরপর শহর থেকে ঐ রোগ দূর হয়ে গেল।এখন মানুষ সেখানে শান্তিতে বসবাস শুরু করল।

জিন্দাওলী নীম রোজে।

হুজুর মাদার সাহেব নীমরোজে পৌছলেন।ওখানের এক বড় সম্মানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি হজরত শাহ লুৎফুল্লাহ ঐ রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন হুজুর সাঃ নির্দেশ দিলেন,মাদার পাকের সেবা কর। ঐ নির্দেশ শোনা মাত্র ই মাদার পাকের সেবায় যাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠল। যখন শুনলেন মাদার সাহেব নীমরোজে এসেছেন।সঙ্গে সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়লো। হুজুরের সেবায় পৌছে দেখলো সেখানে হুজুর সাঃ এর করম ও কৃপার এমন রহমতের সমুদ্র বইছে যে তাতে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে।উনি হুজুরের সামনে বসে পড়লো কিন্তু কোনো কথা হল না।এমন ভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল।একদিন যদি সরকার ওনার উপর রহমতের দৃষ্টি দেন তো ওনার এমন অবস্থা হত , ওনাকে না ভুক পায়, না পিয়াস, না কাপড় গন্ধ হয়। তবে কাপড় যদি গন্ধ হতো তবে উনি কাপড় কে আগুন লাগিয়ে পরিস্কার করে নিতেন।হজরত ওনার নাম দিলেন লুৎফে মাদার এবং ওনাকে নজফ আসরাফে পাঠিয়ে দিলেন।সেখানের মানুষকে কোরান হাদিসের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

এরপর অচেনা অজানা দেশ ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের শিক্ষা ও আদর্শের পাঠ দিতে দিতে ভারতে ফিরে এলেন।

বাংলা,বিহার,উড়িষ্যা,পাঞ্জাব,সিন্ধু,গুজরাট,মধ্যপ্রদেশ,কেরল,মহারাষ্ট্র,উত্তর ভারত,আন্দামান,ভূ-স্বর্গ কাশমির,বাংলাদেশ,শ্রীলঙ্কা,পাকিস্থান,ইত্যাদির লোক কে ইসলামের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রানিত করেন।বহু স্থানে মাদ্রাসা,মসজিদ ও কুঁয়োর ব্যবস্থা করেন।স্থানে স্থানে আপন খলিফা ছেড়ে যেতেন নব মুসলিমদের শিক্ষা দিক্ষা দেওয়ার জন্য।এরপর তিনি আজমের পৌঁছলেন।

আজমিরে শহিদান দের লাস

ইতিহাস সাক্ষী আছে যখন মাদার সাহেব আজমির পৌঁছলেন তো ওনার আগে কিছু মুসলমান জিহাদের জন্য আসে এবং আজমিরের তারাগড় পাহাড়ের উপর থেকে গেলেন এবং ঘোষনা করলেন যে আল্লাহ এক। এখানকার লোক ও সেনারা(রাজার লোক) সাময়িক রুপে ইসলামী সেনাদের আক্রমন করলো। ইসলামী সেনারা যদিও সংখ্যায় কম তবুও পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে।কিন্তু কতক্ষন? ক্ষেত্রিয় রাজারা প্রতিবেশী রাজ্যের নিকট সৈন্য সাহায্য নিয়ে মুসলমান সৈন্যদের হারিয়ে বিজয় প্রাপ্ত হয়। ফলে মুসলমান সৈন্যরা শহীদ হন এতে হিন্দুস্থানী সৈন্যরা আনন্দ করতে থাকে। কিন্তু অন্যায় যুদ্ধ দেখে সূর্য পশ্চিম আকাশে লুকিয়ে পড়ল তখন ওখান থেকে ভয়ঙ্কর জোর আওয়াজ উঠতে থাকলো যতক্ষন রাত্রের আওয়াজ থাকতো ঐ ভয়ঙ্কর আওয়াজ হতে থাকলো। এখন হিন্দুস্থানীরা বিজয়ের নেশার সঙ্গে সঙ্গে মদের নেশায় ডুবে থাকত কিন্তু যখন আওয়াজ নারায়ে তকবির- আল্লাহ আকবর-আসতে শুরু হল তখন ওরা জানতে পারল ওটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই ভয় প্রচন্ড আকার হল যে, বিভিন্ন প্রকার চিন্তা মনে হতে লাগল। কিন্তু যখন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে তখন আওয়াজ সমাপ্ত হয়ে যায়। সূর্য দেখলো যে ইসলামের জাহাবাজ সিপাহীদের শরীর ক্ষতবিক্ষত রণক্ষেত্রে পড়ে, বড় বড় বাহাদুর ও রণকুবের সৈন্য তারা। তো ও আবার দুঃখী ওসুনা সুনা মনে পশ্চিম আকাশে তলে পড়লো। আবার সেই আওয়াজ আসা আরম্ভ হয়ে গেল যখন এই ঘটনা ঘটে গেলো তো এই সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারলো না। প্রতি রাত্রে ওই আওয়াজ আসতে থাকলো। দিনের বেলাও মানুষ এত ভয় করতে লাগলো যে মায়েরা সন্তানধারন করার করার সুখ থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো। কৃষি কাজ ও বিরান হতে থাকলো এবং রাস্তা ঘাট সুন সান হয়ে গেলো।

কুত্বে হকীকী:- আজমিরের মাটিতে

সময় চলে যায় ভারতে হজরত মাদার সাহেবর গুনগান সাধারণ মাঝে চলতে থাকে এবং তিনি আজমিরই এসেছেন।কিছু লোকের মধ্যে বলাবলি হতে থাকলো। যে আল্লাহু আকবর বলনে ওয়ালা একদল আজমিরের তারাগড় পাহাড়ে ছিল। তো তারা একত্রে এসে সরকারকে মিনতি করে বললেন হে বুজুর্গ এবং মহান ব্যক্তি

তোমার আসার আগে ওই রকমই লোক এখানে এসেছিল এবং যাদের আমাদের সেনারা পরাজিত করে মেরে ফেলে। কিন্তু ওদের আওয়াজ আমাদের ব্যাকুল করে রেখেছে। আপনাদের মিনতি করি, দয়া করে এখান থেকে চলে যান।তা না হলে আপনাদের কারনে আমাদের উপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ এসে পড়বে।তখন হজরত মাদার সাহেব ওদের বললেন, যদি ওই ভয়ানক আওয়াজ সমাপ্ত হয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়, তবে তোমরা আমার আদেশ পালন করে চলবে তো? যদি হুজুর আমাদের দয়া উপর করেন তো আমরা জন্ম জন্মান্তর আপনার সেবায় থাকবো।

এরপর ওই সব লোকের উপর তিনি দয়া করলেন এবং বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।তারপর নিজের সাথীদের বললেন, তারাগড় পাহাড়ে ইসলামের জাহাবাজ সিপাহিদের মৃতদেহ বা লাস পড়ে আছে। ওদের কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা হবে। ওনাদের সব লাসের জানাজা নামাজ পড়ে।আরামের জন্য কবরে শুইয়ে দিলেন। যখন সব লাসের কবরের ব্যবস্থা করলেন, তখন আর কোনো আওয়াজ আসছিল না। লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে লাগল।কিছু লোক বলতে লাগলো যদি ওদের আদেশ মেনে চলি তবে আমাদের মুসলমান হতে হবে। আর যদি ওদের আমরা ভয় দেখায় বা আক্রমন করি তবে সম্ভবত ঐ লোক চলে যাবে অন্যথা ওদের আদেশ ত্যাগ করতে হবে। কিছু লোক বলল এই সময় আমাদের বুঝে শুনে কাজ করার দরকার আছে। আমরা যা কিছু ফয়সালা করি না কেন তার ভাল মন্দ বিচার করার দরকার আছে। যদি ঐ বুজুর্গ আমাদের ঐ সব দুঃখ কষ্ট কে সুখে পরিণত করে দিতে পারে মুহুর্তের মধ্যে যা কিনা বড় বড় মুনী ঋষিরা করতে পারে না সেই সব বুজুর্গের সাথে ধোকা করা উচিত নয়। লোকেরা সু বুদ্ধি প্রয়োগ করলেন এবং নিজ নিজ মুখিয়া বা প্রধানের নিকট। আদেশ নিয়ে হুজুরের সেবায় উপস্থিত হয়। এবং নিজ নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্র করার জন্য ওনার হুকুমের অপেক্ষা করেন। সরকার সব লোককে ইসলামের শিক্ষা দিলেন। এবং ওদের ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী তৈরী করলেন, এবং বহু সময় ধরে ওদের মধ্যে ধার্মিক, সহিষ্ণুতা, মানবতা, এবং প্রেম ও অহিংসা পাঠ পড়ালেন। ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শে ঠিক থাকার জন্য হিম্মত পয়দা করে দিলেন। ও তাদের মুরিদ করে নিলেন।

জাদুগর অধরনাথের মুসলমান হওয়ার ঘটনা:-

অধরনাথ নামের এক জোগী, যে কিনা লোককে নিজের অধিনে বসিভুত করে রাখতে পারতো। মাদার সাহেবের গুন গান শুনে জাদুগর খুব চিন্তায় পড়ে গেল, আর জাদুর মাধ্যমে হামলা শুরু করে দিলো। কিন্তু ওর ওই রুপ যাদু সরকারের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। তখন সে সরকারের সামনে লোহার (মটর দানা) চানা নিয়ে গিয়ে বললো, আপনি যদি বড় জ্ঞানী/বুজুর্গ হন,তাহলে এই লোহার চানা খেয়ে দেখিয়ে দিন। আমি তো (জীবন ভোর কিছু না খাওয়ার ব্রত রেখেছি) বা রোজাদার আছি। সুতরাং আমি তো খেতে পারবো না হ্যাঁ তুমি এগুলো আমার শিষ্যদের মধ্যে দিয়ে দাও, ওরা খেয়ে নেবে,, স্বয়ং এক দানা নিয়ে ভূমিতে/মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতেই চানার এমন বড় একটা গাছ হয়ে গেলো ওই

কোকিলা পাহাড়ের উপরে, অন্য ছড়ির গাছের থেকে উচুঁ হয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরে গেলো। অধরনাথ জোগী দেখে তো খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো, এক তো লোহার চানা তার চেলারা খেয়ে ফেললো, তা তো দূরের কথা ওই চানা মাটিতে পুঁতে দিতে বড় বৃক্ষ হয়ে গেলো। এই চমৎকার অধর নাথের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে,হজরতের উপর আর কিছু বলার হিম্মত নেই, তখন সে সোজা গিয়ে হুজুরের চরনে পড়ে কাঁদতে লাগল এবং বলল হুজুর আমাকে আপনার চরণের দাস হয়ে থাকার আজ্ঞা দিন।

সরকার ওকে প্রেমের সঙ্গে তুলে তাঁর উপর বিশেষ কৃপা করলেন। এবং তাঁকে ইসলামের রাস্তায় চলার জন্য ওকে মুসলমান করে দিলেন।

ঐ দিন থেকে একটা কথা প্রচার হয়ে গেল কি ফকীরী লোহেকী চনে চবনা হ্যায়। এরপর কোকিলা পাহাড় যাকে এখন মাদার টীকরী বলে; ওখান থেকে নেমে এক নদীর সামনে এসে পৌছয়।

সাহু সালার গাজী- সৈয়দ মসউদ গাজীর জন্মের শুভ সূচনা-

তওয়ারিক-এ-মহম্মদীর লেখক হজরত মোল্লা মহম্মদ গজনবী লিখেছেন যখন হজরত সাহু সালার আজমির শরীফের নিকট পৌছলেন। সেখানে মুজফফর খাঁ আজমীরির সাহায্যে নদীর ধারে তাবু করলেন। ঐ সময় এক বহু বড় সূফীর সানিধ্যে আসে। তখন উক্ত সূফি ওনাকে দয়া করেন ও আশির্বাদ করেন।এবং ভবিষ্যৎ বানী করেন। যে খুব শিঘ্রই তোমার এক পুত্র সন্তান হবে। যে একজন গাজী হবে। ঐ বুজুর্গ সূফি হুজুর ছিলেন সৈয়দ বদিউদ্দিন অহমদ উনি বলেন আমার সাতটা নাম আসমানে লেখা আছে যা আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী ফেরেস্তারা পড়ে থাকে।তুমি যদি উহা পড়ো তবে তোমার দূঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এবং আল্লাহ্ তোমার উপর বিশেষ কৃপা করবেন অতপর ওনাকে নিজের সাত নাম শিখিয়ে দিলেন। কিছু সময় চলে যাওয়ার পর কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির এক সুন্দর এবং তেজস্বী পুত্র জন্ম নেয়। যার নাম উনি সৈয়দ সালার মাসুদ রাখেন। পরবর্তি কালে, ঐ সৈয়দ সালার - মাসুদ গাজী নামে বিখ্যাত হয়।

ঐ সময় মাদার সাহেব ওনার নিজের এক খলিফা সেখ আলি রাবতী যে কিছু দিন আগে মুসলমান হয়েছিল। তাকে মথুরায় তবলীগের জন্য ছেড়ে দিলেন। আবার সরকার হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দিলেন। এবং দেশে বিদেশে ইসলামের ঝান্ডা উচু করে লোক কে ধার্মিক সহিষ্ণুতা মানবিকতার শিক্ষা দিতে দিতে মক্কা শরীফ পৌছলেন এবং হজ্জ্ব আদায় করলেন এরপর নিজের আকা হুজুর নবী করিম (সাঃ) এর মাজারে হাজিরী দেবার উদ্দেশ্যে মদিনা চললেন। আবার তিনি জিয়ারতের জন্য কাজেমাইন চললেন। কাজেমাইন পৌছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় কিছু দিন কেটে যায়। আবার আপনার সাথীদের নিয়ে বাগদাদ পৌছলেন।

বাগদাদে বিবি নসিবার ফরিয়াদ

বাগদাদে অসুস্থ দুঃখীদের দূঃখের সীমা ছিল না। এমন রোগ ছিল যা কোনো

ডাক্তার সারাতে পারতো না।সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ও এমন দূঃখী ছিল যে তার দূঃখের কেউ কোনো কিনারা করতে পারত না। কিন্তু সরকারের নিকট কাঁদতে কাঁদতে কোনো দূঃখী এলে সে সুখী এবং খুশির খাজানা নিয়ে যেত। কেউ কোনো আশান্তির কথা ওনাকে শোনাতো তো সঙ্গে সঙ্গেই তার শান্তি মিলত। এমনই রোগ গ্রস্থদের মধ্যে এক মহিলা ছিল যার মুখে নিরাশার ভাব খুব স্পষ্ট ছিল। সংসারের সব সুখ সমৃদ্ধি পেয়েও মনে শান্তি নেই। নারীরা এমনিতেই অবলা হয়। সামান্য দূঃখ ওরা সহ্য করতে পারে না।নিজের মনে কিছু বড় দূঃখ চেপে রেখেছে সেজন্য তার মুখের উপর উক্ত দূঃখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। যখন সরকারের দয়া বা কৃপা ওই মেয়েটির উপর হয় তখন ঐ মেয়েটি কেঁদে ফেলে। এবং মিনতী করে বলতে থাকে আকা সংসারের সমস্ত সুখ আমার আছে। আমাকে আল্লাহ পাক ধন ও দৌলতের কোনো অভাব রাখেনি। কিন্তু আমার ঘরে আমার পরে প্রদীপ জালানোর কেউ নেই। আমি এক সন্তানের জন্য আজ পর্যন্ত কেঁদে আসছি। আমার পিতার নাম আবু সালেহ অর্থাৎ আমার ভাই আব্দুল কাদের জীলানী যিনি কিনা হাজার হাজার মানুষের মনের শান্তি এনে দেয়। আমার এই পিপাসা সে দূর করতে পারে না বরং তিনি আপনার কাছেই আসতে বলেছেন। তিনি বলেছেন বদিউদ্দিন নামে বুজুর্গ বাগদাদে আসছে ওনার কাছে চলে যাও, উনি তোমাকে আশির্ব্বাদ করলে তোমার মনের ইচ্ছা পূরন হবে। আমার দূঃখ এবং কষ্ট আপনি মুহূর্তের মধ্যে দূর করে দেবেন সুতরাং আপনার নিকট মিনতী করছি আমাকে আপনি দয়া করুন।আমি সমস্ত প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। এমন কি ভাই আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) ও বলে দিয়েছে আমি লৌহে মহফুজে দেখেছি। তোমার দূঃখ এক মাত্র বদিউদ্দিন নামের এক বুজুর্গ সমাপ্ত করতে পারবে।সে জন্য আমি আপনার সামনে আমার ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কৃপা করে আমাকে আশির্ব্বাদ করুন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, আব্দুল কাদের জিলানী গৌস পাক নিজের বোন কে সরকার মাদার সাহেবের চেহারা বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন শোন বোন খুব শিঘ্রই বাগদাদ শহরে এক বুজুর্গ আসবেন যার মুখে নেকাব বা পর্দা দেওয়া থাকবে। এবং তক্তে সওয়ার থাকবেন। ওনার সঙ্গে অনেক বড় বড় বুজুর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তি থাকবে। যদি উনি (মাদার সাহেব) তোমার জন্য দোয়া করে তবে অবশ্যই তোমার ভাগ্য পুত্ররত্ন মিলবে। কেন না উনি কুত্বে বহদত আছেন। ওনার অধিকার আছে ভাগ্যর লেখা বদনালোর। সুতরাং সরকার উক্ত মহিলা যার নাম বিবি তাহেরা ছিল। তাকে বললেন খুব শিঘ্রই তোমার আঙিনায় দুটি ফুল খেলবে যারা তোমার নাম উজ্জ্বল করবে ইসলামের নাম সংসারে ছড়াবে এবং নিজ নিজ সুগন্ধে সংসারকে মুগ্ধ করে দেবে। কিন্তু এক পুত্র আমাকে দিতে হবে। আবার তাহিরার আপন ভাগ্যর উপর খুশি হল। এবং অপেক্ষা করতে থাকে যদি দুটি পুত্র হয় তবে একটা সরকারের চরনে অর্পন করবেন। এরপর সরকার কিছুদিন পরে বাগদাদ থেকে চলে গেলেন। এরপর তাহিরাকে লোক নসিবা বলে ডাকতে থাকে। কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর নসিবার ঘরে দুটি পুত্র সন্তান এল।

ডুবন্ত নৌকা ভাসতে লাগল

একদিন আপনি (মাদার সাহেব) এক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ব্যবসায়ী নিজের মাল নিয়ে নদী পার করছিলেন এমন সময় এক তুফান এসে ওনার নৌকা ডুবিয়ে দেয়। ২য় ব্যবসায়ী নদীর পাড়ে ছিল কাঁদতে কাঁদতে হুজুর কে এসে বলল হুজুর আমাদের বরবাদী থেকে রক্ষা করুন। তখন সরকার এক মুঠো ধুলো নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করলেন, ফলে সঙ্গে সঙ্গে তুফান বন্ধ হয়ে যায়, এবং উক্ত নৌকা নদীতে ভাসতে থাকে এবং সামান ভরা ছিল এই দেকে ব্যবসায়ীর খুশির সীমা নেই ; ঐ ব্যবসায়ী নিজের সাথীদের নিয়ে মুসলমান হয়ে গেল।

"পানি কুয়ো থেকে বাইরে এলো,,

হজরত মাদার সাহেব এই ভাবে বহু বৎসর কাটিয়ে ছিলেন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যেমে, এখন আবার পুনরায় আপন আকা হুজুর (সাঃ) এর জিয়ারত ও হজ্জ্বে যাবার ইচ্ছা হল। তিনি হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আফগানিস্থান পৌছলেন এবং কাবুলে অবস্থান করলেন। ওখানে ওনার সাথীদের পানির প্রয়োজন হয়। তো সরকার কয়েকজন কে পানির জন্য পাঠালেন। যখন ওরা কুঁয়োর নিকট পৌছয় তখন ওখানকার লোক ওদের পানি নিতে দিল না। তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। তখন নিজের সেবক দের সরকার বললেন যাও কুয়োকে গিয়ে বল, তোর পানি হজরত ইমাম হুসেন এর প্রপৌত্রের প্রয়োজন। সেবকরা পুনরায় যেতে স্থানীয় লোক বলল তোমাদের এই কুয়ার এক ফোঁটা ও পানি নিতে দেব না। ঐ ডোল কুয়োতে ডুবাতে দেব না। তখন এক সেবক বলল, দেখ ভাই তোমরা আমাকে কুঁয়ো কে কিছু বলতে দাও। তোমাদের কুয়োতে ডোল নামাবো না। তারপর কুঁয়োর নিকট এক সেবক গিয়ে বলল হে শীতল শীতল জল তোমাকে ইমাম হুসেনের প্রপৌত্র ডাকছে। এই শব্দ শুনেই কুঁয়োর পানি ফুটতে ফুটতে কুঁয়োর বাইরে চলে এলো এবং মাদার সাহেব যেখানে বসেছিল সেইদিকে বইতে লাগলো। সেবকরা সব নিজের নিজের পাত্র পানিতে ভরে নেওয়ার পর পানি আবার কুঁয়োতে ফিরে গেলো। স্থানীয় লোক এই দেখে খুব আশ্চর্য হল এবং চমকে গেল। এবং সরকারের নিকট এসে নিজ নিজ গলতি বা ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল। হুজুর আমাকে ক্ষমা করে দিন না হলে পুরো কাবুল বরবাদ হয়ে যাবে। হুজুর মাদারে আজম সব লোক কে ক্ষমা দান করলেন এবং সব লোক কে মুসলমান করে নিলেন। এবং কিছু দিন ওখানে রয়ে গেলেন। নতুন মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা এবং আদর্শ পাঠ দান করতো। এরপর তিনি নেপালে গেলেন ওখানে এক পাহাড়ে অবস্থান করেন।ঐ পাহাড় কে আজও মাদারিয়া পাহাড় বলে থাকে। আরও সাতমাঠ পাহাড় আছে। এক চিল্লা (কুঠি) আছে মালভারী নাম, গাও পাহাড়ের নিচে তথা ২য় মাদারিয়া পাহাড় এর শেষ চটি থেকে নেমে মনমোহন এবং শীতল ঝিল এর কিনারায়। এখান থেকে কিছু দুরে চীন এবং নেপালের বর্ডার আছে এই বইয়ের লেখক নিজে ঐ চিল্লায় গিয়ে দর্শন করে এসেছেন, এখানকার লোক বলেন যে সরকার মাদার সাহেব চিনের দিকে

চলে গিয়েছেন। এই সমস্ত দেশে সরকার ইসলামের ঝান্ডাকে উঁচু করেছেন। লোকেদের দুঃখ ও কষ্ট দুর করেছেন এবং কিছু সাথীকে ঐ নও মুসলিমদের শিক্ষা দিক্ষা দেওয়ার জন্য ছেড়ে রেখে আবার তিনি ভারতে চলে এলেন। এখানে তিনি পিলিভিত, রামপুর, বরেলী, মুরাদাবাদ ইত্যাদি শহরে হাজির হয়েছিলেন।এবং এখানে হাজার হাজার মানুষ কে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। এরপর গুজরাট হয়ে হজ্জ্ব আদায় করার জন্য চললেন।মক্কা হতে তিনি মদিনা শরিফে সরকারে হাজিরী দেওয়ার পর পুনরায় ইসলামের মিশন প্রচার করার জন্য চললেন।

নোটঃ- জেদ্দাতে ও সরকারের এক চিল্লা আছে যখানে উনি বেশ কিছু সময় ধরে এবাদতে রিয়াজ্বত করেছেন। এরপর সরকার মাদার সাহেব ইরাকে দিন প্রচার করতে গেলেন। এখানে একটি কুঠি বানিয়ে ছিলেন।লোক আপনার কাছে আসতো এবং আশির্ব্বাদ নিতো।কাউকে ফেরাতো না। কেউ কোনো সংকটে পড়েছে কারো কোনো দুঃখ শোনার মতো নাই কেউ অন্ধ হয়ে লোকের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। সব আসে ওনার কাছে নিজের মনোস্কামনা (মুরাদ) পূরা করার জন্য সবার মনোস্কামনা তিনি পুরো করতেন কারো চোখের রশ্মি দান করতেন। কোনো দুঃখীর দুঃখ মূহুর্তের মধ্যে দূর করে দিতো। কাউকে সংসারের ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের আলোয় তাকে আলোকিত করেছেন। কারোকে মানোবতার, দয়া এবং সহিষ্ণুতার ব্যবহারের পাঠ পড়িয়েছেন। এবং ঘুরতে ঘুরতে আবার বাগদাদে এলেন।

জন্নন - জান্নাতির জিন্দা হওয়ার ঘটনা

যখন মাদার সাহেবের আসার খবর সৈয়দনা নসীবা বিবি শুনলো তখন ওনার সেবায় দুটি বাচ্চাকেই নিয়ে আসতে চেয়ে ছিল, ওদের গোসল করিয়ে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়ে ওদের হুজুরের সেবায় নিয়ে আসছিল। বড় ছেলে মুহম্মদ কোনো কাজের জন্য ছাদের উপর গিয়ে ছিল আর আল্লার মর্জীতে ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। এখানে ঘরে তো খুশির মেলা ছিল আর ওর মৃত্যু ঘিরে এমন মাত্তম হতে শুরু করল যে লোক ভাবতে পারছে না যে কি করবে যেন ঐ ঘরে কারো নজর লেগে গেছে। ভাগ্য একি খেলা খেলছে, এক মা যার সামনে এক পুত্রের লাস পড়ে আর এক পুত্রকে দিয়ে দিতে হবে। অতপর নসীবা হুজুরের সেবায় এলেন এবং বললেন, আমার বড় পুত্র ছিল যাকে আমি আপনার সেবায় দেব ভেবে ছিলাম, কিন্তু আজ ও ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়।সরকার বললেন আমাকে ওই লাস্ ই দাও। তারপর ওই লাসের কাছে গিয়ে তার মাথার চুল ধরে বললেন, হে জানেমন জন্নাতি আল্লার আদেশে ওঠো। মৃত শরীরে ঐ যখন জীবন ফুক দিলেন তখন জান্নান জান্নাতী (মুহম্মদ) উঠে বসে পড়ল, এবং ওনার মুখে কলমা শাহাদত জারি ছিল। হজরত মাদার সাহেবের ঐ কারামত মুহূর্তে বাগদাদের চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নসীবার ভাগ্য কত ভালো দেখো মরা বাচ্চা বেঁচে গেলো। লোকের মধ্যে আলোচনা হতে লাগলো। যে তাহিরার ভাগ্যে এত চিন্তা ভাবনা ছিল।। ঐ তাহিরার ভাগ্য এমন হল যে প্রতিটি মা তাকে নিয়ে গর্ব করে। এরপর ওনার সেবায় দুটি পুত্রকেই

নোটঃ- এখানের লোক আজো মাদারিয়া সিলসিলার মুরিদ হয় এবং ওদের অনেক অনুষ্ঠান যেমন মুন্ডনে বা নেড়া হওয়া মাকানপুর শরীফে এসেই করে থাকে।মেবাতে সরকারের বহু জায়গায় চিল্লা আছে নিরাসার লোক যেখানে আসার আলো দেখে। অর্থাৎ ভাগ্য বদলে যায়।

মাদার সাহেব ভাতিন্দায়

যখন মাদার সাহেব ভাতিন্দাতে পৌছলেন, ওখানে গিয়ে জানতে পারলেন যে ওখানে হজরত বাবা সাহুক বিন জন্দল এসেছেন। তো সরকার ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাবা রতন সাহুক এর ব্যাপারে ঐতিহাসিকগন লিখেছেন উনি মোজিজা (শাকুল কামার) চাঁদের দু টুকরো হওয়ার সময় ইমান এনে ছিলেন।বয়স প্রায় ছশো বৎসর পেয়েছিলেন।

কিতাব মাদারে আজমের লেখক হাকিম ফরিদ আহম্মদ নক্সাবন্দী মুজদিদদী লিখেছেন, বাবা রতন বিন সাহুক বিন সিকন্দর বাজ বলেন রতন বিন নসর বিন কৃপায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল। ছটি শতাব্দীতে (হিজরীর) প্রকাশ হল। এবং বলেন আমি হুজুর (সাঃ) এর সেবাতে ছিলাম।বাবা রতন সাহুক এর পুত্র হজরত মহম্মদ অর্থাৎ হজরত আব্দুল্লাহ ওনাকে রবারতে (অবতরন) করেছেন।

সাহব উসামা বলেন, আমি ঐতিহাসিক শামসুদ্দিন মুহম্মদের পুত্র ইব্রাহিম হুর্জমীর বইয়ে পড়েছি। উনি লিখেছেন আমি নজীব আব্দুল ওহাবের পুত্র ইসমাইল ফারসী সুফির থেকে আমি ৭১২ হিঃ তে শুনেছি যে শীরাজে ৬৭৫ হিঃ তে এক বুড়ো ব্যক্তি যার নাম মহমুদ ছিল এসেছিল যে বলেছে আমার পিতা বাবা রতন সাহুক- মোজেজা শক্কুল কমর (চাঁদের দু টুকরো হওয়া) দেখে ছিলেন। এই কারনেই ভারত থেকে আরব পর্যন্ত যায় এবং হুজুর মুহম্মদ (সাঃ) কে ইমলি উপহার দিয়েছিলেন। যাহা হুজুর (সাঃ) খেয়েছিলেন এবং দীর্ঘায়ুর জন্য আশির্বাদ করেছিলেন। ঐ সময় ওর বয়স ১০০ বৎসর ছিল। তারপর ভারতে এলেন এবং ৬৩২ হিজরীতে এই সংসার ত্যাগ করে পর লোকের উদ্দেশ্যে পাড়িদিলেন।

সমীক্ষা:- এই বইয়ের লেখক (সৈয়দ মহজর আলী) নিজের পিতার নিকট বুজুর্গ হজরত মৌঃ কুত্বে কাল্ব আলী রাঃ শুনেছেন বাবা রতন এর ব্যাপারে একটা ঘটনা প্রচলিত শোনা যায় যা মাদারে আজমে লেখা আছে।

মাদারে আজমের পৃষ্ঠা ১০৭ থেকে ১১১ পর্যন্ত তে লেখা আছে। ইমাম ইবনে হজর অসকলানী বলেছেন, আমাকে আলীর পুত্র মহম্মদ অবী মহম্মদ বলেছেন উমি উদার এর জন্য হাদিস বর্ণনা করেন। জামাল উদ্দিন মহম্মদ সুলেমান কে যে দামিস্কের মুন্সি ছিল। উনি বলেছেন, আমাকে কাজী শামসুদ্দিন মহম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন সানে উল হনফী বলেন, আমাকে কাজী মইনুদ্দিন অব্দুল মুহসিন বিন কাজী জালান উদ্দিন অবদুল্লাহ বিন শাম ৭৩৭ হিঃ তে খবর দেন যে আমাকে কাজী নুরুদ্দীন বলেছেন আমার দাদা হুসেন পুত্র মুহম্মদ এক হাদিস বলেছেন, যে আমার বয়স সত্তর বৎসর ছিল। আমি আমার বাবা ও কাকার সঙ্গে ব্যাবসার ব্যাপারে ভারতে গিয়েছিলাম, ওখানে এক গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম কিছু লোক বলল যে এখানে হজরত বাবা রতন থাকত। আমরা ওখানে এক বিশাল বৃক্ষ

দেখলাম যার নিচে বহু লোক এক সঙ্গে ছিল। যখন আমরা ওখানে পৌছলাম তো লোক গুলো আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমরা দেখলাম বৃক্ষের ডালে একটা বড়ো থলে ঝুলছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই থলেতে কি আছে ? ওরা উত্তর দিল এতে বাবা রতন আছে যাকে হুজুর (সাঃ) দীর্ঘায়ু দান করেছিলেন ছয়বার। আমরা বললাম যে ওনাকে নিচে নামাও আমরা ওনার দর্শন করবো তখন থলে নীচে নামিয়ে ওর মুখ খোলা হল, ওতে রুই বা উইপোকা লেগে ভর্তি হয়ে ছিল, যার মাঝ খানে রতন ছিল এক ব্যক্তি বাবা রতনের কানের কাছে গিয়ে বলল দাদাজান এই লোক খুরাসান থেকে এসেছে এবং তোমার কাছে জানতে চাই তুমি হুজুর (সাঃ) কে কতদিন আগে এবং কি ভাবে দেখেছেন। বাবা রতন এই শুনে বলল, আমি আমার পিতার সাথে আরবে ব্যবসার জন্য গিয়েছিলাম যখন আমরা মক্কা পৌছলাম তখন সবে বর্ষা শুরু হল। এত পানি হয়েছিল,যে সেই পানি খুব তেজে বইছিল। এই জল তেজে বয়ে যাওয়ার জন্য এক তেজস্বী বালক ওর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।যার উট জলের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল। আর উনি ওপারে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি মানবতার খাতিরে উক্ত বাচ্চাকে কিনারায় পৌছে দিলাম। উক্ত বাচ্চা বালক প্রেমের সঙ্গে আমার দিকে দেখতে দেখতে আরবী ভাষায় আমাকে তিনবার বলল বারাকল্লাহে ফি উম্রেকা। অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবি হও। আমরা মক্কায় পৌছালাম অর্থাৎ ব্যাবসার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে গেলাম এই ঘটনার বহু দিন পরে আমরা এক রাত্রে ঘরের উঠানে বসেছিলাম সেই রাত ছিল চাঁদনী। চাঁদকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হঠ্যাৎ চাঁদটি দু টুকরো হয়ে গেলো। এমন কি এক টুকরো পূর্ব দিকে চলে গেলো এবং ২য় টুকরো পশ্চিম দিকে চলে গেলো।আবার দুটো টুকরো এক সাথে জুড়ে গেলো। আমাদের খুব আশ্চর্য্য লাগলো।আমি লোকের থেকে জানতে শুরু করলাম বিশেষ করে যারা আরব থেকে ব্যবসা করে ফিরছিল, ওদের থেকে জানতে পারলাম যে আরবে মক্কা শহরে হজরত মহম্মদ নামক হাসেমী বংশের এক ব্যক্তি নিজের নবুয়তের ঘোষনা করেছেন। সুতরাং এটা তারই মোজেজা ছিল। যা লোকেদের চাহিদা পূরনের জন্য করেছিলেন। তখন আমার হজরত মহম্মদের (সাঃ) সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।অতপর নিজের যাত্রার জন্য নিশ্চিত করলাম, মক্কায় পৌছে ওনার ঘরের ঠিকানা নিয়ে একেবারে ওনার ঘরের সামনে গিয়ে আওয়াজ দিলাম, এবং আমার ঘরের যাওয়ার জন্য অনুমতি মিলল। যখন আমি ঘরের ভেতর গেলাম তো দেখলাম, ঐ ব্যক্তিকে, যার মুখ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চাঁদের কিরন ছড়াচ্ছে। যার মানবতা তথা দয়া উবচে পড়ছিল।কিছু লোক তার সাথী ছিল এবং ওনার সামনে খেজুর রাখা ছিল, আমি উহা দেখে ভয়ে ভীত হয়ে ঐ দূরেতে বসতে চাইলাম কিন্তু ওনার পাশেতে বসার নির্দেশ দিলেন। যখন ওনার সামনে বসলাম তো আমাকে উনি নিজে হাতে খেজুর খেতে দিয়েছিল। এরপর তিনি বললেন আমাকে চিনতে পারছো ? আমি বললাম না। হুজুর বললেন যখন আমি ছোট বাচ্চা ছিলাম তুমি আমার উট পর্যন্ত আমায় পৌছে দিয়ে ছিলে।

মাদারে আজম কাল্পীতে

এরপর উনি কালপী শহরের ভাগ্যকে আলোকিত করতে এলেন। ওখানের জনতার দূঃখ,যন্ত্রনা মূহুর্ত মধ্যে দূর করে দিলেন, একদিন মীর সদর জাঁহা এক চিঠি লিখলেন, যাতে উনি মাদার সাহেব কে মিনতি করেন। আকা আমায় আপনার সেবায় নিয়ে আমাকে ভাগ্যশালী করুন। আমি কাল্দি আসতে পারছি না কারন জৌনপুরের বাদশাহ ইব্রাহিম শার্কী আমাকে পদের জন্য ঠিক করেছেন। আর কাল্পীর বাদশাহ তথা জৌনপুরের বাদশা একে - অপরকে বিচ্ছেদ করেছেন। যদি আপনি আদেশ দেন তো ঐ পদ ছেড়ে আপনার সেবায় চলে যায়। শাহ মাদার সাহেব ঐ পত্রের উত্তর দিলেন, হুজুর সরকারে দো আলম (সাঃ) আমাকে ভারত এবং অন্য দেশেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠিয়েছেন। এবং আমায় এক বিবরন দিয়েছেন। যাতে উপকৃত হওয়াদের মধ্যে তোমার নাম ও আছে। সুতরাং তুমি আমার সেবায় অবশ্যয় এসো। মীর সদর জাঁহা এই পত্র পড়ে খুব সন্তুষ্ট হয়ে ওনার নিকট যা কিছু ছিল সব কিছু দান করে দিলেন।

মাদারে আজম জৌনপুরে

কাদির শাহের ওই আচরনের পর মাদার সাহেব কাল্পী থেকে জৌন পুরে এলেন। এখানে ওনার জন্য সুলতান ইব্রাহিম এবং মীর সদর জাঁহা খুব ব্যাকুলতার সাথে অপেক্ষা করছিলেন। মাদার সাহেবের আসার কথা শুনেই ওখানের ওনার স্বাগতের জন্য আসে।

এখন বেশী বেশী সময় তিনি ইসলামের শিক্ষা এবং হুজুর সাঃ এর মহব্বত তথা ইসলামী রীতি ও নীতি মেনে চলার উপর অধিক জোর দেন।

মীর সদর জাঁহা মাদার সাহেবের তরফ থেকে অপেক্ষা করার আদেশ পেয়েছিল।যখন অপেক্ষা শেষ হয়ে গেল, মীর সদর জাঁহা ওনার সামনে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।আর ঠিক ঐ সময় এসে গেলেন মাদার সাহেব এবং ওনাকে মুরিদ ও খলিফা বানালেন।কেতাবে প্রকাশ আছে যে, ঐ সময়ে প্রায় এক লাখ টাকা এবং অন্ন,বস্ত্র,ও সবজি গরীবদের মধ্যে দান করেছিলেন।সরকার আপনার চেহরা থেকে যখন নকাব সরালেন, তখন সদর জাঁহা বেহুশ হয়ে গেলো।যখন হুশ আসে তো তিনি মুশা আঃ এর ঝলক দেখতে পেলেন।মাদার সাহেব বললেন বাইরে লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমিও যাও অপেক্ষা করো আমি আসছি। তখন সদর জাঁহা ও বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হাশিয়া:- ঐতিহাসিকগন লিখেছেন কুতুবে মাদারের ১২টা শরীর থাকতে পারে সুতরাং একই সময়ে ১২ জায়গায় উনি থাকতে পারেন। এই জন্য ওনার চিল্লার হিসাব নেই। যা আন্দাজ করা যায় না।

সৈয়রুল মাদারে জহীর আহম্মদ সাহেব চিস্তী কাদিরী সহসবানী লিখেছেন কি জৌনপুরে যখন হুজুর মাদারে আজম ছিলেন তখন ওনার সেবায় হুজুর আলী অসব মীর সদর জাঁহার নিকট সরকারের সব কথা শুনে বলল এই রুপ বুজুর্গ সুফির নিকট সব কিছু বলার দরকার আছে। এই কথা শুনে সদর জাঁহা পীরের নিকট

এলেন। তাতে পীর বললেন তোমার উজির খুব বুদ্ধিমান ছিল। যাও তুমিও উজীর হয়ে গেলে। এরপর মীর সদর জাঁহা মুখ্যমুন্ত্রী হয়ে গেল।

সাহিবে তারিখে সালাতী শার্কয়া ও সুফিয়া-এ- জৌনপুর লিখেছেন খাঁর আতঙ্কে দুঃখী হয়ে তির মুজের থেকে দেহলী (দিল্লী) এসে সংসারে ধর্ম করেন। এই সময় কাকোরী শরীফের তাকিয়ের সাদাত ভারতে এসেছিলেন। মীর সদর জাঁহার পিতা ঐ সময় বড় বড় বিঞ্জজনের মধ্যে একজন। জৌনপুরে সুলতান ইব্রাহিম শার্কী ফকীরদের প্রতি দয়া মায়া এবং ভাল ব্যবহার এবং বিঞ্জ জনের সম্মান এবং শিক্ষা সংরক্ষনের জন্য খুব প্রশংসা হতে থাকে। এরই কিছু সময় সন সদর জাঁহা এখানে মুখ্যমুন্ত্রী হয়। মীর সদর জাঁহার শিক্ষা প্রাপ্তির খুব শখ ছিল, এজন্য উনি সৈয়দ মীর আসরফ জহাঙ্গীর সমদানীর সেবায় এলেন। তিনি বললেন তোমার হিস্যা আমার এখানে নেই।খুব শিঘ্রই তোমার এখানে এক বুজুর্গ আসছেন। যার নামবদিউদ্দিনআহমদ হবে।তার চেহারায় নেকাব থাকবে যখন কাল্পী আসবে তো তুমি ওনার নিকট মুরিদ হবে।কেন না মীর সদর জাঁহা জৌনপুরের উজির বা মুখ্যমুন্ত্রী ছিল।কাল্পী এবং জৌন পুর শাসকের মধ্যে শত্রুতা ছিল।

মাদার সাহেব বাইরে এসে মুখের নকাব তুলে দিলেন, লোক উক্ত জামাল রুপ দেখে সেজদায় পড়ে বেহুস হয়ে যায়।উনি এক ঘটনা শোনায় যা শুনে সবার হুস হল।এবং নিজে নিজে সবাই মুরিদ হতে লাগল ওর মধ্যে কয়েক জন কে খলিফা করে দিলেন। মীর সদর জাঁহা চাইল রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করে দেবে। কিন্তু সরকারের জন্য হুকুম দিলেন না। কিন্তু বললেন তুমি ঐ পদে থেকে বহু মানুষের সেবা করতে পারবে। তোমাকে আল্লাহ বড় কাময়াবী দেবে অর্থাৎ তুমি আল্লার বিশেষ কৃপা পাবে। মাদারে আজম তথা তুহফতুল আসরায়ে লেখা আছে হজরত মীর সদর জাঁহা হুজুর মীর অশরফ জহাঙ্গীর সমদানী কচ্ছোবীর মুরিদ হতে চাইতো কিন্তু উনি মানা করে বলেন খুব শিঘ্রই এক বড়ো বুজুর্গ হুজুর সৈয়দ বদিউদ্দিনের থেকে উপকৃত হবে। সরকার মাদার পাক জৌনপুরে লোক কে ফয়েজ পৌছেছিলেন। সমস্ত জনতা ওনার কাছে আপন আপন দূঃখ কষ্টের জন্য শোনায় এবং শান্তি পায়, কাজী শাহাব উদ্দিন কিদবই (রাঃ) যে কিনা খুব সুন্দর ছিল এবং শিক্ষায়ত্ত মহত্ব পূর্ন ছিল ওনার মুরিদ হয় ও খলিফা প্রাপ্ত হয়। উনি বহু দিন ধরে এখানে ছিলেন। লোক ওনার নিকট আসত এবং প্রার্থনা করতো ভালাইয়ের জন্য মাদার সাহেব সবার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করত এবং খোদার নিকট দোয়া করতেন, এবং লোককে ইসলাম ধর্মের কথা শোনাতেন। একদিন ওনার এক সাথীর সঙ্গে কোনো এক শহর বাসীর ঝগড়া হয় এতে শহর বাসী মারা যায়। লাশ বা মৃত দেহটি কে লোক সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর নিকট নিয়ে এল। এবং ওনার শিষ্যকেও উপস্থিত করলো।শিষ্য বলল যাকে আমি মেরেছি ও একটা পাগল কুত্তা ছিল। এরপর লাসের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল ওটা একটা কুত্তার লাস, ইব্রাহিম শর্কী এই কারামত দেখে বড় আশ্চর্যীত হল এবং জিজ্ঞেস করল আপনি কে ?

বুজুর্গ নিজ আকা হুজুর মাদারে পাকের নাম বলল সুলতান এই শুনে নিজে কে আর স্থির রাখতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত হলেন।

তখন তিনি জৌনপুরেই ছিলেন তো হজরত মীর হুকের মৌইজ বলখী নিহার থেকে হেঁটে হেঁটে ওনার সেবায় এলে অপেক্ষমান দের সাথে বসে গেলেন। ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে হুসৈনের জন্য আপেক্ষ করা হচ্ছে। হুসৈন ভিতরে এসো ওখানে ঐ নামের অন্য লোকও বসে ছিল, অতপর আবার আওয়াজ এল হুসৈন মৌইজ ভিতরে এলো তখন হুসৈন ভিতরে গেল, উনি বললেন হুসৈন আমার কাছে এসো এবং আমার পাশে এসো, তখন হুসৈন এ শের পড়ল।

অগর যক মু-এ বরতর পরম,
ফরৌগ-এ- তজল্লা বসৌজদ পরম।।

মাদারে পাক বললেন, তু তৌহীদ কা সমুন্দর হ্যায় তুই তোহীদের সমুদ্রে রে, আমার আরো পাশে আয় তথা ওনার মুখের উপর নজর পড়ে তো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

মী গৌয়ন্দ কে হক সুরত ন বন্দদ,
মনই কে দীদ হ অম জাত্তে মসবির

এবং সেজদায় পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হল ওনাকে বললেন। কিতাব অবারিফুল মআরিফ বের কর, এবং কিছু পৃষ্ঠা পড়ালেন যার ব্যাপারে হজরত সেখ শরফুদ্দিন যহয়া মুনীরী ভবিষ্য বানী করে ছিলেন কি তুমি ঐ কিতাব হুজুর মাদার সাহেবের নিকট পড়বে, যখন মাদার সাহেব উক্ত কিতাব পড়াচ্ছিল তখনে ওনার মধ্যে একটা ভাবের উদয় হচ্ছিল হজরত হুসৈন মৌইন নবিশু -এ- তৌহীদ কিতাব পড়তে পড়তে ওর মধ্যে এমন ভাবে ডুবে গেলেন যে ওনার রঙ পরিবর্তন হতে থাকলো। ঐ বই পড়তে পড়তে ইস্কে মহম্মদীর মধ্যে আসতে আসতে ডুব দিতে লাগল। এখন ওনার কাছে সংসারের রচয়িতার সমস্ত ভেদ খুলে গেল।এরপর মাদার সাহেব জৌনপুরে ছেড়ে লখনউ এলেন।

জৌনপুরে:- কিতাব মলফুজাত শাহ মীনার ২১৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে সরকার বদিউদ্দিন জিন্দাশাহ মাদার ছিলেন। কিন্তু। কিন্তু নমাজ জুমার জন্য মসজিদ করেনি।এখানের বাদশাহ সুলতান ইব্রাহিম শর্কী কিছু লোক পাঠায় যাতে উনি জুমার নামাজ আদায় করে তথা বিশেষ রূপে লোককে আশির্বাদ করে। যখন লোক ওনার কাছে আসেন এবং জুম্মায় না যাওয়ার কারন জিজ্ঞাসা করেন। তো মাদার সাহেব বললেন- তোমরা আমার এবং সুলতানের মধ্যে মিথ্যা কথা বোলো না। সুলতান কে বলে দিও জুমা তিন ব্যাক্তির জন্য মহিলা, গুলাম এবং মুসাফিরের জন্য নয় সুলতান হিংসা করলেন, আপনি কে, উনি বলেন মুসাফির কাকে বলে ?

মাদার সাহেব নিজের আসন তুলে নিয়ে লখনোউ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে বললেন একে মুসাফির বলে। অতপর সুলতান তার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং ক্ষমা চায়। তখন ওনার কাছে হাজার হাজার লোক মুরিদ হয়। কিছু ব্যক্তিকে খিলাফত ও দিলেন। ঐ রুপ ভাগ্য বান ব্যক্তির মধ্যে হজরত সৈয়দেনা মৌলানা সেখ ফৌলাদ (রহঃ) ও ছিলেন যার মাজার শরীফ মাকানপুর শরীফ এ আছে। এর মধ্যে ভিখারী শেখ মজজুব (রাঃ) ও সরকারের ফয়েজ পায়। ওনার মাজার কলৌজে। হজরত মহম্মদ ইনিয়াস (রাঃ) ওনার থেকে ফয়েজ পায়, এবং খিলাফৎ পায়।

সিরাজ উদ্দিন সোক্তা পুড়িয়ে যায়

ওনার (মাদার সাহেব) সাথে সব সময় ১৪৪২ জন খলিফা থাকতেন, পত্রিকা ইলিয়াসে লেখা আছে ওনার সাথে এক লাখ খলিফা সব সময় থাকত, যাদের কাজ ছিল সরকারের জন্য এক হুজরা/ কুঠি তৈরী করা যেখানের মাটিতে সরকার চরন রাখতেন সেবকরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কুঠি বা হুজরা/ চিল্লা তৈরী করে দিতেন, ওনার দারোয়ানের কাজ করতো জিনেদের বাদশা ইমাদুল মুল্ক।

সেখ আব্দুল রহমান চিস্তী কুদস সিরহু মিররতুল আসরার কেতাবের পৃষ্ঠা ১০৯৬ তে লিখেছেন, মাদার সাহেবরা হর মুজ থেকে হয়ে কাল্পীতে ছিলেন। তিনি নিজের মত জনতার ভালোর জন্য এক মনে করে আসছিলেন। ওনার থেকে লোকের সমস্ত রকম কষ্ট নিবারন হচ্ছিল চিরি দিকে ওনার গুনগান হতে লাগল। এবং ওনারই জয় জয়কার হতে থাকলো।কাল্পীর বাদশাহ কাদির শাহ ওনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, দরোয়ান ঘরের ভিতরে যেতে মানা করলে। এবং বলে এটা জালালিয়তের সময় এখন দেখা করা যাবে না। এরপর কাদির শাহ উকিঁ মেরে দেখতে চাইলো কিন্তু দেওয়াল উচু হয়ে গেল। যখন কাদির শাহ ঘোড়ার উপর উঠে উকি মারে দেওয়াল আরো উচু হয়ে যায়। হাতির উপর সওয়ার হয়ে দেখতে চেষ্টা করে তো দেওয়াল পুনরায় উচু হয়ে গেল। এরপর কাদির শাহ রাগান্বিত হয়ে চলে গেল এবং বলল আমার রাজ্য থেকে যেন বাইরে চলে যায়।মাদার সাহেব যখন শুনল তখন তিনি যমুনার পাশে চলে গেলেন এবং নিজের সেবকদের বললেন তিনদিন পরে কি খবরহয় দেখে নিও।

কাদির শাহ যখন বাইরে বের হল তো কিছু সময়ের পরেই শরীরে ভয়ানক জ্বলন শুরু হল।যখন সহ্য করতে পারছিল না তখন ওনার পীরের জামা পরিয়ে দেয়। ফলে কাদির শাহ জ্বলন ভাল হয়ে যায়। সরকার মাদারে আজম যখন বুজতে পারলো তখন তিনি বললেন, সিরাজ উদ্দিন জরান সৌক্ত, অর্থাৎ সিরাজ উদ্দিনের কেন জ্বলল না এরপর সিরাজ উদ্দিন খুব খারাপ ভাবে পুড়ে গেল। ঐ দিন থেকে সিরাজ উদ্দিন কে সোক্তা বলা হয়।সিরাজ উদ্দিনের মৃত্যু ঐ অসুখেই হয়। আর উনি নিজের চেলাদের ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন আমায় বিনা গোসলে দাফন করবে সে জন্য সকলে এই সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হয় যে যেহেতু ওসিয়ত করে গেছেন, ওনার একটি আঙুলে জল ঢেলে দেখা হোক।যখন পানি ঢালা হল দেখা গেল ও পুরো ছাই হয়ে গেছে। বইয়ে লেখা আছে যখন কাদির শাহ আপন পীরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রবল ভাবে হল, তখন কোনো কারনে দেখিয়ে ওনাকে মানা করা হয়।

এখানে কাদির শাহ নিজের পীরকে গোপন করে মাদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দেখা না হওয়ায় উনি খুব রেগে গেল এবং নির্দেশ দিলো মাদার সাহেব যেন তার রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। ফলে মাদার সাহেবের রোষ দৃষ্টি কাদির শাহের উপর পড়ল এবং ইহাতে সিরাজ উদ্দিন ক্ষমা প্রার্থনা না করে নিজে কাদির শাহের জ্বালা রোধ করেছিল। যার পরিনাম স্বরূপ বিনা গোসলে দাফন করতে হল।

[বি: দ্র: মাদারে আজম হজমুল কুতুব তহফুল অবরার]

মাদারে পাক শাহ মীনা কে কুতুব বানালেন।

মলফুজাত হজরত শেখ মীনা সাহব লখনৌ এর পৃষ্ঠা নং ২১৩ তে লেখা আছে যখন হুজুর মাদারুল আলামীন লখনৌ পৌছেলেন তোঐ সময় এক ব্যাক্তির স্ত্রী চার মাস অসুখে ভুগছিল, এমন অবস্থা যে বাঁচার আশা ছিল না। একে বারে মরনাপন্ন অবস্থা পৌছয়। মাদার সাহেবের সেবায় এসে কানাকাটি করে এবং কাকুতি মিনতি করে, হুজুর আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসি ও মারা গেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।ও এত অসুস্থ যে ওর জীবনের আশা খুব কম। সুতরাং আপনি আমার উপর দয়া করুন।কৃপা করুন।মাদার সাহেব তুমি শেখ শাহ মীনার নিকট চলে যাও তোমার দূঃখ শেষ হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি আবার মিনতি করলো আমি শেখ শাহ মীনাকে চিনি না। তখন হুজুর তাঁর নিজ খলিফা ও সেবক সেখ শাহাব উদিনের সাথে পাঠালেন এবং বললেন ও এই সময় হজরত কবাম উদ্দিনের মাজারে আছে, ওকে আমার এই জানমাজ এবং এ থৈলী দিয়ে দিও এবং বোলো এই ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য যেন দোয়া করে হুজুরের নির্দেশ অনুযায়ী যখন শাহাব উদ্দিন ওখানে পৌছয় তো শেখ শাহ মীনা, ঐ সময় কিশোর অবস্থা ছিল তখন দেখা হয়, সেখ সহাব উদ্দিন জানমাজ এবং থৈলী দিয়ে বললেন, আকা মাদারুল আলামিন এই বস্ত্র গুলো পাঠিয়েছেন এবং এই মহিলার জন্য জানমাজে দাড়তে গেলেন তো তার পা থরা থরিয়ে কাঁপতে লাগল, তখন উনি শাহাবুদিন কে করার জন্য বললেন কিন্তু উনি বললেন না দোয়া আপনি করবেন আমি কেবল আমিন বলবো। এরপর ওনারা সবাই নামাজ পড়লেন এবং সেখ শাহ মীনা মহিলার জন্য দোয়া করলেন ও শাহাবুদ্দিন আমিন বললেন। ঐ মহিলার অসুখ মুহূর্তের মধ্যে ভালো হয়ে গেল।এবং ক্ষিদের জন্য খেতে চাইল। ওনাকে ক্ষীর খেতে দেওয়া হল, ফলে শিঘ্রই সুস্থ হয়ে গেল। তখন সেখ শাহাবুদ্দিন দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে দক্ষিন পর্যন্ত জায়গার লোক শাহ মীনার বলায়তে আসতে থাকে এবং ওনার থেকেই সব লোক লাভবান হতে থাকল। কিতাবে লেখা আছে হুজুর শাহ মীনা হুজুর মাদার পাকের জনামাজের সাদকায় উক্ত দোয়া করেছিলেন। এরপর থেকে শাহ মীনার গুনগান সাধারন মানুষ করতে থাকে।

হাশিয়াঃ- (উদাহরন) যখন সরকার জৌনপুরে থেকে লখনৌ এলেন তো ঐ সময় ওখানে কবাম উদ্দিন কুতুব ছিল।

বদিউল আজাএবে- এর পৃষ্ঠা ২৯-এ লেখা আছে, হুজুর মাদার পাক যখন লকনৌ পৌছলেন তখন ওনার পরিষ্কার জন্য হজরত কাবাম উদ্দিন এলেন। ঐ সময় কাজী শাহাবুদ্দিনের উপর কালা-এ- আতিম (রাঃ) ছিল সেজন্য যে মাদার পাকের সঙ্গে ছিল কিশোর অবস্থায়। ওনাকে দেখে কাবাম উদ্দিন বলল আচ্ছা এই বাচ্ছাও তাসাউফ শিখতে এসেছে। এরপর মাদার সাহেব বললেন, এখানে যে যা নিয়েত করে আসবে তাই পাবে। ঐ উত্তরে কাবাম উদ্দিন একে বারে চুপ হয়ে গেল এবং ঘরে এসে মারা গেল। এই কারনে কুতুবের জায়গা খালি হয়ে যায়। এবং উনি ওখানে শাহ মীনাকে বসিয়ে দেন।

কিতাব বাহারুল মাআলী তে মহম্মদ বিন মীর জাফর মক্কা লিখেছেন মাদার পাকের এ অধিকার আছে যে কুতুব কে চাহে শেষ করে দেয় এবং ওনার স্থলে দ্বিতীয় কুতুব বানিয়ে দেয়।দুররল মুনজ্জম এ লেখা আছে এক কুতুব ১৬ আলমের বা সংসারের অধিকারী হয়। এক এক আলম এত বড় হয় যে যার মধ্যে পুরা সংসার (আকাশ পৃথিবী) ওর মধ্যে পড়ে যায়।

বদিউল আজাএবের পৃষ্ঠা ১৩-তে লেখা আছে কি হজরত কুতুবুল মাদার যখন খুরাশান পৌছয় এবং কিছু দিনের জন্য রয়ে গেল, তখন ওনার খলিফা জামাল উদ্দিন জানেমন জন্নতী শহরে ঘুরতে ঘুরতে হজরত নাসীর উদ্দিন যে ঐ শহরের কুতুব ছিল। তার সঙ্গে দেখা হয়। জানেমন জন্নতী নাসীর উদ্দিন কে বলেন, তোমার শহরে কুতুবুল মাদার এসেছে, তুমি ওনার সেবায় আসনি কেন ? যাও আর ওনার থেকে উপকৃত হও। হজরত নাসীর উদ্দিন বলল আমি তোমার মতো অনেক দিবানা দেখেছি। তুমি তোমার নিজের কাজ করো এই কথা শুনে জামাল উদ্দিন অনেক দূঃখ হয় এবং ওনার কতুবিয়ত খতম করে দিলেন, সরকার বললেন নাসীর উদ্দিন তোমার দিলে দূঃখ পৌঁচেছে ও এখনি আসবে। যখন নাসীর উদ্দিন কতুব থেকে বাদ হয়ে যায়, তখন ভয়ে ভয়ে নাসীর উদ্দিন মাদার সাহেবের পাশে এলেন। মাদার সাহেব বললেন জানেমন জন্নতীর নিকট ক্ষমা চাও, অতপর হজরত নাসীর উদ্দিন জানেমন জন্নতীর নিকট ক্ষমা চাইল এবং পুনরায় সে কুতুব হয়ে গেল। তখন সরকারের নিকট আরো ফয়েজ পেলেন। সরকার মাদারে পাক নাসীর উদ্দিন কে নিজের খলিফা ও বানালেন এরপর ওনার হালাত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেলো। এরপর মাদার সাহেব কন্তর চলে গেলেন।

হাসিয়া- (উদাহরন) তখন সরকার লখনৌয়ে ছিল। যখন হুজুর কুত্বে আলম শাহ মীরা সাহবের জন্ম হয়েছিল। কিতাব মাদারে আজমের লেখক আল্লামা হাকীম ফরিদ আহম্মদ আব্বাসী নক্সা বন্দী মুজদিদদী লিখেছেন, লখনৌ-এ- এক বুড়ি স্ত্রী মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত হয়ে বলে হুজুর আজ এক বাচ্ছা জন্ম নিয়েছে যে এখনো পর্যন্ত দুধ পান করে না; তখন সরকার বললেন রমজানের চাঁদ উঠে গেছে আর ও বাচ্ছা আল্লার ওলী এই কারনে ও দুধ পান করে না।

মাদারুল আলামীন কিন্তরে

মাদারে আজমের পৃষ্ঠা নং ১২৪-এ লেখা আছে, যখন মাদার সাহেব কন্তর শরীফ পৌছয়; এবং মসজিদে উপস্থিত হয়। তো কিছু সময়ের মধ্যেই নমাজের সময় হয়ে যায়। মাদার সাহেব সব সাথীদের সাথে নামাজ আদায় করে নেয়। কিছু সময় পরে কাজী মহম্মদ নামাজ আদায় করতে আসে। উনি দেখলেন মুসাফির কারোর জন্য অপেক্ষা না করেই নামাজ আদায় করে নিয়েছে তো ওনার খুব রাগ হল, কেন না দ্বিতীয় জামাত কে মকরুহ মনে করতো উনি বলল হে অচেনা অতিথি আপনি আমাদের অপেক্ষা না করেই নামাজ আদায় করে নিলেন। আমাদের জমাত হবে না। হজরত মাদার সাহেব বললেন, নামাজের এক সময়ের মধ্যেই পড়ে নেওয়া উচিত। তুমি এত দেরী করে এলে কেন ? এরপর কাজী মহমুদ চুপ হয়ে গেল। মাদার

সাহেব বললেন তুমি কোরান পড়ো নি, উনি বলল হ্যাঁ সরকার বলল কুরয়ান নিয়ে এসো এবং আমার সামনে পড়ো। যখন কাজী মহম্মদ কুরয়ান নিয়ে খুলল, এবং পড়তে চাইল দেখল ওতে কিছু লেখা নেই, তো এই কারামত দেখে ও খুব আশ্চর্যীত হল। ওনার নাম জানতে চাইল, যখন শুনল ওনার নাম হজরত বদিউদ্দিন আহম্মদ যিনি মোর্তবায় ব্রারাউল বরায় আসিন আছে তখনই তার সেখ আবুল ফতহ শক্তারী জৌনপুরীর ওসিয়তের কথা মনে পড়ে গেল।

কাজী মহমুদ এর কিশোর অবস্থায় ওনার পিতা সেখ হামিদ কাজী মহমুদকে সেখ আবুল ফতহের সামনে নিয়ে দোয়া প্রার্থনা হল এবং হজরত সেখ আবুল ফতহ নিজের টুপি কাজী মহমুদ মাথায় পরিয়ে দেয় কিন্তু বাচ্চা তা খুলে দেয় এই ভাবে তিনবার উনি মাথায় টুপি পরিয়ে দেয় আর বাচ্চা তা খুলে দেয় এতে ওনার পিতা রেগে গিয়ে বাচ্চাকে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু ঐ সময় ওনার কুতুবুল মাদারের (রাহঃ) খেয়াল এল যিনি বলেছেন, শেখ এই বাচ্চা আমার অংশ থেকে তৈরী তখন সেখ আবুল ফতহ বলেছিল সেখ হামিদ তোমার বেটা মহম্মদ শিঘ্রই এমন ব্যাক্তির নিকট যাবে, যিনি একজন কুতুবুল মাদার হবেন। এবং ওনার নাম বদিউদ্দিন আহমদ হবে।

যখন কাজী মহমুদের নিজের ছোট বেলার ঘটনা স্মরনে এল তখন উনি বুঝে নিল যে এই বুজুর্গ বদিউদ্দিন আহমদ হবে। যার জন্য আবুল ফতহ ভবিষ্যৎ বানী করেছেল বহু বছর আগে। তখন তিনি মাদারে পাক কে আরজু জানালো যে আমাকে মুরিদ করে নিন। সরকার বললেন ইল্ম জাহেরী তোমার জন্য বড় পর্দা তা তোমাকে ভুলতে হবে, না হলে তুমি আমার মুরিদ হতে পারবে না। কাজী বলল এটা আমার জন্য কঠিন ব্যাপার সরকার তখন নিজের লালা মোবারক কাজীর ঠোটে লাগিয়ে দেনযাতে ওনার দুনিয়া বদলে যায়। এই ঘটনার পর সরকার কাজী মহমুদকে মুরিদ করে নেয়। এবং ওনার মধ্যে রুহানী ইল্ম দান করে দেয় তখন কাজী মহমুদ বড় সুফি এবং বুজুর্গের মধ্যে ধরা হয়।

কাজী মহমুদের থেকেই সিলসিলা-এ- তালিবান গোরহ,র শুভারম্ভ হয়। এবং হজরত মৌলানা কাজী মহমুদ কস্তরী কে সিলসিলা-এ-মাদারিয়ার বড় বুজুর্গের মধ্যে একজন ধরা হয়।

ঘাটমপুরে সরকারের আগমন

সাধারন লোকের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তি শান্তির সৎ ভাবনার শিক্ষা দিতে দিতে ঘাটমপুরে এসে পৌছলেন এখানকার রাজা মাদার সাহেবের গুনগান শুনে ওনার কাছে এলেন এবং প্রার্থনা করলেন হুজুর আমার কোনো সন্তান নেই যদি দয়া করেন তো আমি সন্তান প্রাপ্ত হই। তখন সরকার ওকে বললেন, তোমার দুটি সন্তান হবে আমাকে একটি দিতে হবে। কিছু পরই উক্ত রাজার দুটো সন্তান হল এবং ওয়াদা অনুযায়ী এক পুত্র কে ওখানে রেখে গেল। কিছু দিন পর অর্থাৎ ১০ বৎসরে বাচ্চার একদিন ঘরের কথা মনে পড়ায় খুব কাঁদছিল তখন মাদার সাহেব ঘরে যাবার অনুমতি দিলেন। ও ঘরে যেতে চাইছে না কারন ও মুসলমান হয়ে গেছে। মাদার

সাহেব বলল তুমি এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী তুমি যাও তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। পরবর্তীকালে উক্ত বাচ্চা ঐ রাজ্যের রাজা হয়েছিল।

গুজরাটে সেখ ইলিয়াসের বয়েত হওয়া

ঘাটমপুর থেকে মাদার সাহেব গুজরাট পৌছে সেখানে সেখ ইলিয়াসকে মুরিদ করেন। গুলজারে-এ-মাদার বইয়ের পৃষ্ঠা নং ১১৪-১১৫ তে লেখা আছে সেখ ইলিয়াস গুজরাটের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন ওনার দেখা খীজ্র (আঃ) সঙ্গে হয়।ওনার কাছে সেখ ইলিয়াস বিজয়ের সঙ্গে জানালেন হুজুর ইল্ম-ই-লাদুন্নী (লুকোনো রহস্য বিদ্যা) আমার জানার খুব ইচ্ছা, খিজ্র (আঃ) বললেন গুজরাটে এক প্রকান্ড বিদ্যান ব্যক্তির আগমন হবে। উনি তোমাকে ওই বিদ্যা শিক্ষা দেবে যা তোমো আজীবন মনে রাখবে। এরপর এক পেয়ালা শর্বত পান করায় এবং বললেন প্রথমে সাংসারিক শিক্ষা গ্রহন করো। এরপর সেখ ইলিয়াস শিক্ষা গ্রহন শুরু করে এবং তাকে শেখুল ইসলাম বলা হত। পাঁচ বৎসর কেঁটে যাবার পর হুজুর মাদারে আজম যখন গুজরাট পৌছয় তো সেখ ইলিয়াস ওনার মধ্যে পুরো লক্ষন দেখতে পায়। যে সকল লক্ষন হজরত খিজ্র (আঃ) বলেছিলেন। এখন সেখ অধিকাংশ সময় হজরতের সেবায় গুজরে যায়। একদিন হজরত মাদার সাহেব সেখকে বলে সংসারের তো মৃত্যু তাকে ছেড়ে দাও। উনি ওয়াদা বা প্রতিঙ্গা করলেন কিন্তু ঘরে এসে সংসারের মোহ ছাড়তে পারলো না, এবং এই মায়াবী জালে ফেঁসে গিয়ে বলতে থাকে, কেন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবো ? এ এরপর হজরতের সঙ্গে ধীরে ধীরে ত্যাগ দেয়। এরপর ওনার চামড়া এক প্রকার সাদা দাগ হতে লাগল। যার কারনে উনি ঘর থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর হঠ্যাৎ ওনার মনে হল এই রোগ আমার হয়েছে মাদার সাহেবের দিলে দুঃখ দেওয়ার কারনে হয়েছে ব্যাস তখনি দৌড়ে ওনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাকে। হুজুর ক্ষমা করে দিলেন, এবং উনি সারা জীবন ওনার সেবায় কাটালেন।

সপ্তম বারের হজ্জ্ব

উনি গুজরাট থেকে খাম্বাত পৌছয়, যেখান থেকে উনি সপ্তম হজ্জ যাত্রা শুরু করলেন। মাদার সাহেব অনেক বার হজ্জ করেছেন যার মধ্যে কয়েক বার কিছু সমুদ্র পার হয়েছেন আবার কখনো স্থলভাগ দিয়ে গিয়েছেন। ওনার সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা এমনি বলা যায় যে যখন হজরত খাজা গরীব নওয়াজ (মইনুদ্দিন চিস্তী) রাঃ সিন্ধু নদীর পুল দিয়ে যাচ্ছিলেন তো উনি নদীকে জিজ্ঞাসা করেন। এই নদী তোমার উপর দিয়ে এখন পর্যন্ত কতজন মোমিন গিয়েছেন ? দরিয়া উত্তর দিল আমার উপর দিয়ে এখন পর্যন্ত আড়াইটা মোমিন গিয়েছে- খাজা জিজ্ঞাসা করেন- আড়াইটা মোমেন কে কে ? নদী বলল প্রথম মোমিন হজরত সৈয়দ বদিউদ্দিন রঃ, ২য় মোমিন হজরত জাকারিয়া মুলতানী রঃ। আর আধা আপনি। এরপর খাজা লাহৌর পৌছয় ওখানে হজরত উসমান অলি হিজবেরী দাতা গঞ্জ বক্স লাহৌরীর

মাজারের নিকট চিল্লা করেন এবং যার জন্য কিছু বললেন তার দুই লাইন দেওয়া হইল।

গঞ্জ বক্স-এ-ফয়েজ- আলম মজহর-এ- নুর-এ- খোদা নাকিসা রাপীরে কামিল কামিলাঁ রা রহনুমা।।

এরপর যখন খাজা সাহেব আবার সিন্ধু পার হচ্ছে তখন নদী বলল, আল্‌হামদুলিল্লাহ এখন আমার উপর দিয়ে ওয় মোমিন যাচ্ছে। এ ছাড়া মাদার সাহেব যখন স্থল ভাগ এর রাস্তা দিয়ে যেতেন তো তিনি অনেক জায়গায় চিল্লা করেছেন।যার চিহ্ন আজো দেখা যায়।

ইরানের ঘটনা

হজরত মাদার সাহেব ইরানের এক ময়দানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওনার সাথে মুরিদান ও খলিফারা ছিল। এটা হজরত আবু তোরাব ফন্সুর রঃ এর কথা, তিনি বললেন ঐ ময়দানে কোনো এক ব্যক্তির খুলি দেখতে পাওয়া গেল। যখন মাদার সাহেব ঐ খুলির নিকট পৌছল তখন উনি খুলিকে প্রশ্ন করলো তুই কে তোর ঘটনা কি ? আল্লাহ পাক ওই খুলির জবান খুলে দিল, এবং উহার বলার ক্ষমতা ফিরে এল, এবং নিজের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। হে আল্লাহর ওলী আমি ওমুকের পুত্র ওমুক এবং ওমুকের পুত্র ওমুকের নিকট কাজ করে আমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার নির্বাহ করতাম। ঐ সময়ই হজরত আজরাইল ফেরেস্তা এসে আমার রুহ বের করে নিয়ে যায়। আমি সেই থেকে ১২ বৎসর বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে আসছি। হজরতের বড় দূঃখ হল, মাদার সাহেব ঐ খুলির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। ফলে ওই খুলি এক নতুন জীবন পেল। ঐ খুলির নাম উনি জমজমা রাখলেন। যে ১২ বৎসর জীবিত ছিল। মৃত্যুর পর আবার ঐ ইরানেই কবরস্ত করা হয়। যেখানে আজো বহু মানুষ বিভিন্ন প্রকার মানত করে থাকে ও খুশিতে ঝুলি ভরে নিয়ে যায়। জমজমার শাব্দিক অর্থ খুলি।

এরপর মাদার সাহেব রাস্তা পাল্টে আবার যাত্রা শুরু করলো। ইরান, ইরাক ইত্যাদিতে আজো ওনার চিল্লা দেখা যায়। এটা ওনার শেষ হজ্ব যাত্রা ছিল। যখন মাদার সাহেব হজ্ব সমাপ্ত করে নিজের আকা হুজুর (সাঃ)এর রওজায় সালাম করতে গেলেন তখন হুজুর (সাঃ) হুকুম করলেন হে বদিউদ্দিন হিন্দুস্থানের কনৌজে যাও, কনৌজের দক্ষিনে এক পুকুর আছে যেখান থেকে আওয়াজ আসছে ইয়া আজীজো ইয়া আজীজো। যখন তুমি পুকুরে নিকট পৌছবে তখন দেখবে পুকুরটি শুকিয়ে গেছে, ঐ খানেই তুমি থাকবে তোমার ওই জায়গায় শেষ বাসস্থান।

কাজী মাসুদ মুরিদ হওয়ার ঘটনা

হুজুরের নির্দেশে কনৌজের উদ্দেশে রওনা হলেন উনি নজফ এলেন। কাজী মসুদ রঃ নিজের বই খাজিনাতুল অবরার এ লিখেছেন আমি ছোট বেলায় এক নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠ্যাৎ পাঁ পিছলে আমি নদীতে পড়ে যায়। এক নূরানী চেহারা ওয়ালা বুজুর্গ এল যার মুখে নুরানী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আমাকে নদী

থেকে তুলে আনলেন। আমি বুজুর্গকে খুব মনোযোগের সাথে দেখলাম। আমাকে মৌলানা ইয়াহইয়া নজফ নিয়ে গেলেন। যেখানে মাদার সাহেব ছিলেন, আমাকে ওনার সামনে নিয়ে যাওয়া হল এবং উনি আমাকে মুরিদ করলেন এবং খেলাফতি দিলেন। আমি ওনার সেবায় ৪০ বৎসর ছিলাম। আর ওই বুজুর্গ কুতুবে মাদার ছিলেন।

হজরত আহমদ আরজ এর ঘটনা

হজরত আহমদ আরজ নামে এক ঘোড় সওয়ার ছিল। এক দিন ঘোড়ার পা পিছলে মাটিতে পড়ে বেহুস হয়ে যায়। ঐ সময় হুজুর মাদার সাহেব আগমন হয়। উনি বললেন হে আহমদ এই মৃত সংসারে কতক্ষন বেহুস হয়ে থাকবে? আহমদের এই কথা শুনে হুস এসে গেল এবং মাদার সাহেবের চরনে স্পর্শ করতে চাইল কিন্তু ব্যাথা ও যন্ত্রনার জন্য ওখান থেকে উঠতে পারল না। মাদার সাহেব নিজের ঘোড়াকে ডাকল তখন ঘোড়া ওনার কাছে এল। ওনার দোয়ায় আহমদ আরজ পূর্ব রূপে সুস্থ হয়ে যায়।

মাদারে আজমের পৃষ্ঠা নং ৫৯ তে মৌলানা হাকিম ফরীদ আহমদ নক্স বন্দী লিখেছেন।

হরসাহে খাজাগানের ওনার সঙ্গে যাত্রা

নজফ থেকে মাদার সাহেব হলব শহরের নিকট চুনার এলেন ওখানে ওনার আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এবং নিজের ভাই আব্দুল্লার তিন পুত্র ছিল তাদের লালন পালন এর ভার নিয়ে চলে এলেন।

ঐ তিন ভাইপো যাদের নাম যথাক্রমে হজরত খাজা অবু মহম্মদ অরগুন, হজরত খাজা সৈয়দ অবুতুরাব ফন্সুর এবং খাজা সৈয়দ আবুল হসন তৈফুর।

মাদার সাহেব আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল এলেন, কাবুলের এক ব্যক্তি নিজের মেয়েকে নিয়ে এলেন ওনার নিকট যে অন্ধ ছিল ঐ ব্যক্তি হুজুরের নিকট এসে কান্নাকাটি করে বিনয়ের সঙ্গে বলল হুজুর আমার এই মেয়ে অন্ধ এর উপর আপনি দয়া করুন ও দোয়া করুন যাতে ও চোখের জ্যোতি ফিরে পায়; সরকার ওর এই অবস্থা দেখে আল্লার নিকট ফরিয়াদ করলেন এবং ওই মেয়েটি চোখের জ্যোতি ফিরে পায়। সরকার এই কারামতে লোকের নিকট খুব নাম প্রচার হয়ে গেল। এবং বহু মানুষ ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিল।

হজরত শেখ ঈশাকে প্রশ্ন

মাদার সাহেব আফগানিস্তান থেকে ভারতে এলেন। ওখানে জৌনপুরে কিছু দিন রয়ে গেলেন। এখানে হজরত ঈশা জৌনপুরী সরকারকে কিছু প্রশ্ন করে।

হজরত ঈশা জৌনপুরী হজরত শাহাবুদ্দিন মলিকুল উলামার শিষ্য ছিল। উনি প্রশ্ন করেছিল হুজুর আপনি কিছু পানাহার করেন নি কেন ? মাদার সাহেব উত্তর দিলেন

কোরানের তেলায়ত এমন ভাবে কর যাতে শক্তি ও সামর্থের জন্য আহার না দরকার হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য তেলায়তই যথেষ্ট।

মিশরে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ওখানের লোক তখন ইউসুফ (আঃ) দেখে নিতেন তো তাদের ভুখ মিটে যেতো। তাহলে যে নিজের রবকে দেখতে পায় তার কি কখনো ভুখ পিয়াস থাকতে পারে,? হুজরত সৈয়দ বদিউদ্দিন এইরুপ খোদার পিয়ারা ছিলেন। যে নুরে খোদা ওনাকে নুরানী চেহারাতে এমন জ্যোতি ছিল যে যদি কেহ একবার দেখতো তো সে অমনি সেজদায় লুটিয়ে পড়তো। এজন্য তিনি সর্বদা চেহারায় পর্দা ফেলে রাখতেন।

সরকারের সঙ্গে ফুলের কথা

শিরাজ হিন্দ জৌনপুরের ঘটনা ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে সরকারের সেবায়, একদিন শেখ ঈশা জৌনপুরী কেওড়া ফুল পাঠালেন সরকার সেই ফুল ফিরিয়ে দিলেন এরপর শেখ বললেন, খুশ্বু অস্বিকার করা দিল দুঃখানা জায়েজ নয়, তো সরকার বললেন যদি সন্দেহ জনক না হয়। শেখ কিছু বলার আগেই বলল আমি এক হারাম খানে ওয়ালার ঘর থেকে এসেছি, এরপর সেখ লজ্জিত হল এবং হুজুরের নিকট ক্ষমা চাইলা।

নামাজের প্রতি অমনোযোগী

হজরত মাদার সাহেব একবার জৌনপুরের এক মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন, জমাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ১ম রাকাত শেষ হল না শেষহল না তিনি জমাত থেকে বের হয়ে একলা নামাজ আদায় করতে শুরু করলো। যখন নামাজ পড়া হয়ে গেল তখন সবায় এই সম্বন্ধে ওনাকে জিঞ্জাসা করায় উনি উত্তর দিলেন, লা সালাতা ইল্লা বৈহুজুরিল কল্ব - দিলকে আল্লার দিকে রুজু করা বিনা নামাজ হয় না। এবং ওলীদের কথা পুরো নামাজে ধ্যান কেবল আল্লাহর দিকে লাগানো চায়। ইমাম সাহেবের নামাজে ধ্যান ছিল না। যখন আমি ইহা দেখলাম তখন জমাত থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। যখন ইমাম সাহেবকে জিঞ্জাসা করা হল, তো ইমাম সাহেব স্বীকার করে নিলো।

মাদারে আলমকে হুজুর মৌঃ মালেকুল উম্মার প্রশ্ন

হজরত মালেকুল উম্মার শাহাবুদ্দিন দৌলতাবাদী সুলতান ইব্রাহিম শর্কী জৌনপুরীর দরবারী আলেম (ধার্মিক বিদ্যান) ছিল, ওনার জন্য চাঁদির চেয়ার দরবারে ব্যবস্থা ছিল। বাদশাহ এত ভালো বাসতো ওনাকে একবার উনি অসুস্থ হওয়ায় নিজে হাতে এক পেয়ালা পানি নিয়ে আল্লার নিকট প্রার্থনা করে যে আল্লাহ পাক, যে অসুখ মালেকুম উলামার তা যেন আমার হয় এবং উলামা ভাল হয়ে যায়, যখন মাদার সাহেব জৌনপুরে উপস্থিত হলেন তো উনি সময় পেলেই বাদশাহর কানে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু কথা লাগিয়ে দিত। কিন্তু বাদশার মনে এতে কোনো প্রভাব পড়লো না, কারন মাদার সাহেবের কারামত রোজ কোনো না কোনো মানুষ

দেখতে পেতো। আর শাহাবুদ্দিন রোজ খুব লজ্জায় পড়ে যেতো। অতপর মাদার সাহেবের নিকট কিছু প্রশ্ন পাঠালেন। মাদার সাহেব যার উত্তর খুব বিবেচনা করে উত্তম রুপে দিয়ে ছিলেন। মাদার সাহেবের এই ঘটনা বড় মহত্মপূর্ন এবং প্রভাব কারী রুপে আরবী এবং ফারসী ভাষায় ঐতিহাসিকগন সুরক্ষিত করেছেন। যা পরে উর্দূ কিতাবে ও পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে মাদার সাহেবের যে চিঠি ছিল ফারসীতে তা বাংলায় অনুবাদ দেওয়া হল।

আমার ভাই শাহাবুদ্দিন তুমি দুটি প্রশ্ন করেছো একটি হল

১/ ব্যাক্তি শ্রেষ্ঠ না কাবা শ্রেষ্ঠ এবং ২/২য় টি হল উলামায়ে দীন নবীগনের উওরাধিকারী এইক্ষেত্রে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা কি ঐ শিক্ষা নয় যা আমি অর্জন করেছি ? না উহা কোন শিক্ষা?

১ম প্রশ্নের উত্তর কাবার উপর আল্লাহর গুনের ছায়া আর ব্যাক্তির উপর জাতির ছায়া সুতরাং ব্যাক্তিই শ্রেষ্ঠ।

২য় প্রশ্নের উত্তর ঐ ঞ্জানের তাৎপর্য এটাই যে সংসারে রচয়িতার রচনা এবং তার সর্ম্পকে আল্লাহ কি চায়। কেন না খোদার সব কথা নবী অবশ্যই জানে এবং নবীর লক্ষ্য কে বাড়ানোর জন্য যে দায়িত্ব নেয় সেও জানে যে লোক আরিফ বিল্লা হয় তাঁর নিকট আল্লার কোন রহস্য গোপন থাকে না, এবং ঐ ব্যাক্তিই বাস্তবিক উত্তরাধিকারী হয়। প্রলয়ের (কায়ামত) এর পর মানুষকে হাশরের দিনে হিসাব কিতাবের জন্য যখন দাঁড় করানো হবে তো ওনাদের স্থান আলাদা এবং বিশিষ্ট হবে। এবং যে ঞ্জান সাংসারিক ঞ্জান থেকে পাওয়া যায় না।এর জন্য ধর্ম ঞ্জান এর সঙ্গে সঙ্গে কঠোর তপস্যা এবং সাধনা করতে হয়। যে ব্যাক্তিকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়, ওই ব্যাক্তি জন্য সেই কাজ সহজ হয়ে যায়। যে ঞ্জান আপনি অর্জন করেছেন ওতে কঠিন রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। যাতে বহু সমস্যায় পড়তে হয়। যার মধ্যে কোরয়ান এবং হাদিশের সার প্রাপ্ত হয়।এই প্রকার ঞ্জানের জন্য কোনো বাদ বিবাদের প্রয়োজন হয় না। কেন না বাদ বিবাদে মানুষ এবং খোদার মধ্যে পর্দা পড়ে যায়।

অল ইল্মু হিজাবুর্ল আকবর এর শাব্দিক অর্থ ও এটায় তাৎপর্য্য এটা যে জাহিরী ইল্মে খোদা এবং ওর বান্দার মধ্যে পর্দা পড়ে যায়, যা আদ্ধাত্মিক ঞ্জান থেকে পর্দা উঠে যায়। পত্র পড়ে কাজী শহাবুদ্দিন জেনে গেলেন হজরত মাদার সাহেব প্রকান্ড বিদ্যান সুতরাং ওনার মধ্যে সমস্ত প্রকারের ঞ্জান বিদ্যমান এরপর সিরাজ উদ্দিনের পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ও শুনলেন, অতপর মাদার সাহেবের সেবায় আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং ওনার সামনে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন কিন্তু কাজী সাহেবের অহংকারের জন্য তখন মাফ করলেন না তাতে কাজী সাহেব রাত দিন পেরেশান ছিল। এরপর উনি হজরত গৌসে আলম মখদুম আশরফ সামনানী কছৌছবির নিকট যান সুপারিশ করার জন্য বলেন যাতে মাদার সাহেব ওনাকে ক্ষমা করে দেন, হজরত সৈয়দ মীর আসরফ জহাঁগীর সমনানী কছৌছবি একটি চিঠি লিখে দেন যাতে কাজী সাহেব কে ক্ষমা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। চিঠি নিয়ে কাজী সাহেব

পুনরায় মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত হতে হজরত ওনাকে ক্ষমা করে দেন এবং নিস্বতে তৈয়ফুরীয়াতে ভূষিত করেন।

এই ভাবে কাজী শহাবউদ্দিন মালেকুম উলামা কে হজরত মাদার সাহেব বয়েত করেন এবং খিলাফতি দেন।

সৈয়দনা জিন্দাশাহ মাদারের জৌনপুরে ফিরে আসা

মাদার সাহেব বহু বার জৌনপুরে যান।প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত জৌনপুরে ছিলেন, ওখানের সাধারন মানুষ এমন কি বাদশাহ পর্যন্ত ভেবেছিল হুজুরের মাজারের জন্য এই স্থানকেই বেছে নিয়েছেন।

একদিন আপনার সাথীদের এবং শিষ্যদের জৌনপুর ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন এই সংবাদ বাদশাহের কানে গেল, তখন বাদশাহ ও তার মন্ত্রি ও সভাসদদের নিয়ে মাদার সাহেবের সেবায় এলেন। এবং বললেন আমাদের কি ভুল হয়েছে যে আপনি এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন আমি আল্লার মর্জি ছাড়া কিছু করি না। এটা তারই মর্জি আমাকে সরকারে দো আলম (সাঃ) যে জায়গায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেই গন্তব্য স্থলের দিকেই যাচ্ছি।

যখন সাধারন লোকের মধ্যে কথাটি প্রচার হল যে সরকার শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে তো অধিক সংখ্যক লোক ওনার সেবায় এসে কান্নাকাটি করে বিনয়ের সঙ্গে বলতে থাকে হুজুর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না তখন হজরত এমন দুঃখ এবং পেরেশানী দেখলো তখন তিনি বললেন আমি একবার আবার আসবো তোমরা পেরেশান হয়ো না। এরপর বাদশাহ ও অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিসহ হাজার ও লোক ওনার মুরিদ হল। এবং মাদার সাহেব কনৌজের দিকে যাত্রা আরম্ভ করলো।

সরকার মাকানপুর শরীফ এলেন

হিজরী ৮১৮ তে মাদার সাহেব মাকানপুর প্রথমবার এলেন, ঐতিহাসিকরা লিখেছন যে উনি যখন পুকুরের নিকট এলেন তো ওখান থেকে ইয়া আজিজো ইয়া আজিজো আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন পুকুরটি শুকনো ছিল, সাথীদের বললেন এ সেই জায়গা যার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ঐ সময় এটা জঙ্গল এবং ফাঁকা শুনসান ছিল। এখানে বসবাসের কেউ ছিল না। নিজের সাথীদের আদেশ দিলেন যে এই শুকনো পুকুরেই আমার এক হুজরা (কুঠি) বানাও, এরপর ওনার সব সাথী ওখানেই থাকতে শুরু করলো। কিছুক্ষন পর জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কী মাদার সাহেব কে এক প্রার্থনা পত্র পাঠালেন, আমার বিয়োগ ব্যাথা আর সহ্য হচ্ছে না, আপনার যদি হুকুম হয় তবে কিছু সময়ের জন্য আপনার সেবায় আমি আসতে পারি। এবং আমার পীর ভাইয়েদের জন্য কিছু ঘর বানিয়ে দিয়ে আসি। যাতে ওখানে কিছুদিন পর আপনার মাজারের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। এই পত্রের উত্তরে মাদার সাহেব বললেন তুমি এখন এখানে এসো না। কিছুদিন পর আমি জৌনপুরে আসছি।

যখন সব লোক বুঝতে পারলো যে হুজুর ওই জায়গায় থাকবেন তখন দুর দুর থেকে লোক এসে ওখানে ঘর তৈরী করে থাকতে শুরু করল। আর এই ভাবে জঙ্গলে মঙ্গল হতে শুরু হল।

ফারসী ভাষায় কোনো কবি ঠিকই বলেছেন:- আউলিয়ারা হর কুজা মসকন বুবদ। গর হমা দস্ত অস্ত গুলশান মী শবদ।

মাদার সাহেব কনৌজের মহামারী রোগ দুর করেন

ঐ সময় কনৌজের একটি ব্যাবসায়ীক ক্ষেত্র এবং রাজধানীর কিছু অংশ ছিল, এজন্য ওখানে বেশী সংখ্যায় লোক জীবন যাপন করতো। ঐ সময় কনৌজে কলেরা রোগ এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যে মহামারির আকার নেয়, ওখানের বেশীর ভাগ লোক সরকারের নিকট আসে এবং কান্নাকাটি করে বিনয়ের সঙ্গে জানায়, যে এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। উনি বললেন আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি এক শর্তসাপেক্ষে সবাই বলল আপনার সমস্ত শর্ত আমাদের মঞ্জুর কিন্তু চল্লিশ দিন কোনো মানুষ না মরে। হুজুর বললেন ঠিক আছে চল্লিশ দিন কেউ মরবে না কিন্তু তোমাদের সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে হবে।

হজরত তখন সেখানে কাজী শহাব উদ্দিন কিদবই কে কনৌজে পাঠালেন। শহরের এক কোনে দাঁড়িয়ে শহরবাসীর জন্য আল্লার নিকট দোয়া করলেন। ফলস্বরুপ শহর থেকে এক আগুনের গোলা বের হতে তা কাজী সাহেব ঠান্ডা করে দিলেন। এরপর তিনি মাকানপুর শরীফ ফিরে এলেন। এধার ৩৯ দিন হয়ে গেল শহরের কেহ মারা যায় না। তখন শহরের লোক এক পরিকল্পনা করল, যে এক বৃদ্ধ কে মেরে ওনার নিকট নিয়ে যাবেন তহলে ৪০ দিনের মধ্যে বৃদ্ধা মারা গেছে দেখতে পারলে আর ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে হবে না এই যুক্তি করে, শহরের বুদ্ধিমান ছিল ভীকা ও গোপাল, শহরের মানুষ তাদের যুক্তি বা বুদ্ধি গ্রহন করতো। তারা শুনে বলল, যে ভালো করতে পারে সে আবার খারাপ ও করতে পারে সুতরাং ওনার সঙ্গে ওই রকম চালাকী না করে ইসলাম কবুল করে নেওয়ায় ভালো। এই কথা শুনে সবায় চুপ হয়ে গেল, ভীকা এবং গোপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিল দেখতে দেখতে সমস্ত শহরে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মহাম্মাদার রসুলুল্লার ধ্বনি ধ্বনিত হতে লাগল। এরপর কিছু সাথীদের নিয়ে মাদার সাহেব আবার জৌনপুরের উদ্দেশ্যে মাকানপুর থেকে রওনা হলেন।

হাসিয়া:- হুজুর মাদার-এ-পাক বাদশাহ ইব্রাহিম শর্কীকে মাকানপুর শরীফ আসতে মানা করেন কেন না যখন তিনি স্বয়ং কোনো জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান তো পথে প্রত্যেক জনপথে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতেন যাতে লোকের দুঃখ দুর হতো এবং ইসলামের বাস্তবিক শিক্ষা ও আর্দশ সেখানে ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারতো।

হাসিয়া:- হজরত মখদুম আসরফ জহাঁগীর সমদানী কছৌছবী রাঃ হুজুর মাদারে পাক এর সাথে প্রায় ১২ বৎসর ছিলেন, মাদার সাহেব যখন শেষ হজ্জ করেন তো হজরত ওনার সাথে রোম পর্যন্ত ছিল। এরপর দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল।

রাজগীরে কুতুবুল মাদারের ফয়েজ

সায়রুল মাদারের পৃষ্ঠা নং ৪০ তে লেখক জহীর উদ্দিন সহসবানী কাদিরী লিখেছেন, হুজুর মাদারে আজম দ্বীনের প্রচার করতে করতে কাল্পী যায়। তো রাস্তায় যখন রাজগীর এর উপর দিয়ে তক্তা উড়ে যাচ্ছিল, তখন হজরত মখদুম (রাঃ) এক দেওয়ালের উপর ছিল যখন মখদুম রাঃ মাদার সাহেব কে দেখলো তখন দেওয়াল কে বলল শাহান শাহে-এ- আউলিয়া কুতুবুল আক্তার হুজুর মাদারুল আলামিনের তক্ত আসছে তুই ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য দশ কদম আগে চল। এই কথা শুনে দেওয়াল এগিয়ে গেল। যখন হজরত মখদুম হজরত মাদার সাহেবের সামনে এলো তো মখদুম রাঃ এক গ্লাস পানি ওনার দিকে বাড়িয়ে ছিলো। হজরত মাদার সাহেব হাসতে হাসতে নিজের হাতটাকে একটু ঝাকুনি দিল ফলে পানিতে একটা গোলাপ ফুল পড়ে গেল।

মাদার সাহেব যখন কাল্পী পৌছলেন তখন কাদির শাহের রাজত্ব শেষ হয়। এবং ঔরঙ্গাবাদের বাদশাহ কাল্পীর দখল নেয়।কাদির শাহ ও সিরাজ উদ্দিনের পুড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রত্যেকটা মানুষের মুখে মুখে ছিল। যখন মানুষ জানতে পারলো মাদার সাহেব আসছে তো লাখ লাখ লোক ওনার সেবায় আসা শুরু করল। মাদার সাহেব চিল্লা বা (কুঠি) থেকে বের হয়ে মুখের একটি অথবা দুটি পর্দা তুললেই লোক সব সেজদায় বেহুস হয়ে যেতো, যখন হুস আসতো তো পড়ে নিতো কলমায় লা-এলাহা ইল্লাল্লা মুহম্মাদার রসুল্লাল্লাহ।

নোট:- হজরত মখদুমের পানি পেশ করার উদ্দেশ্যে ছিল পৃথিবীতে ওলীদের কমি নেই। তবে ফুলকে পানিতে ফেলে দিয়ে এটা বোঝাতে চাইলেন যে আমি এমনই যে পানিতে ভাষমান ফুল।

কাজী সৈয়দ সদ্রুদ্দিন

হজরত কাজী সৈয়দ সদরুদ্দীন জৌনপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যান ছিল। পিতার নাম সৈয়দ রুকন উদ্দিন। উনি শুরুতে দিল্লীতে থাকতেন। হজরত যখন শিক্ষা সর্ম্পূন করে নেয়। তো পিতার স্থানে শিক্ষকের কাজে যোগ দেন। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি তাসাউফের কেতাব পড়তেন।যখন হজরত কাজী সদরউদ্দিন ও মাদার সাহেবের সেবায় পৌছলো তো হজরত মাদার সাহেব নিজের মুখের পর্দা তুলে দিলেন ফলে উপস্থিত লোক এবং কাজী সাহেব পড়ে গিয়ে বেহুশ হয়ে গেলো। যখন হুশ ফিরে এল তো মাদার সাহেব কাজী সাহেব কে বলল তুমি যে শিক্ষা গ্রহন করেছো তা প্রথমে দিল থেকে মুছে ফেলো। কাজী সাহেব বলল এ কিভাবে সম্ভব? তিনি তিনি এক আমল পড়তে বললেন, এতে অহঙ্কার ইত্যাদি সব দূর হয়ে যায়। কিছু দিন ইহাকে নিয়মিত পড়তে থাকো সব ঠিক হয়ে যাবে।কাজী সাহেব ওই মতো চলতে থাকে, ফলস্বরূপ ওনার দুনিয়ায় বদলে যায়। অতপর মাদার সাহেব কাজী সাহেবকে মুরিদ করলেন। এরপর তপস্যা করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে চল্লিশ দিনের জন্য এক চিল্লায় বসিয়ে দিলেন। যখন চিল্লা

খতম হল তখন বাস্তবিকই ওনার অন্তরের জ্ঞানের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয়। এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ ভাব জন্মায়, সমস্ত সময় ঈশ্বরের ধ্যানে কাটাত।

হুজুর কুতুবুল মাদার এর জৌনপুরে আগমন।

হুজুর মাদার পাক কাল্পী থেকে জৌনপুরে এলেন। ঐ খবর শুনে বাদশাহ তার সভাসদ সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে মাদার সাহেবের সেবায় উপস্থিত হলেন। লোকের মধ্যে ইদের মত খুশি এসে গেল সব সময় ওনার সেবায় ভীড় লেগে থাকত।

উদাঃ- সম্ভবত সন ৯৫ - ৯৬ তে আমি এক কিতাব দেখে ছিলাম কাল্পী শরিফে এক পাথরের সিংহ মাদারের চিল্লার কাছে এমনই পড়ে থাকে। উহাকে এমনি সবায় দেখতে আসে, একদিন কিছু বে দ্বীন তাদের ধর্মের চিহ্ন মনে করে উক্ত সিংহের মূর্ত্তী তুলে নিয়ে যাবার একটা পরিকল্পনা করে ওটাকে তোলার জন্য রাতের অন্ধকারে কিছু লোক একটা ট্রাকটার নিয়ে আসে, ঐ লোক যখনই সিংহের নিকট পৌছায় তো উক্ত সিংহ সত্যকার রুপ নিয়ে ওদের উপর আক্রমন করে। ওরা তো ট্রাকটার ফেলে রেখে গ্রামের দিকে ছুটে পালিয়ে প্রান বাঁচায়। গ্রামের লোক ঘটনা শুনে গুজব বলে, ওদের সঙ্গে নিয়ে এসে দেখে সত্যিকার সিংহ, তা দ্বিতীয়বার ওদের উপর আক্রমন করতে আসে। তবে তারা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে পালিয়ে যায়।

আজো ঐ পাথরের সিংহ চিল্লার পাশে রাখা আছে যার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আগের থেকে এখন বেশী হয়ে গেছে।

হজরত কুতুবুল মাদার থেকে ফৈজ পায় আজমল অজমলী

জৌনপুরে ওই সময় আজমল অজমলী নামে এক বড় বুজর্গ এবং ইল্মুল আম্সারের বড় বিদ্যান ছিল। ইনি কেতাব অবারিফুল মুআরিফ হজরত মাদার সাহেব এর নিকট পড়েছেন। সৈয়দ আসরফ জাহাঙ্গীর সমদানী নিকটে ও ফয়েজ প্রাপ্ত। বাদশাহ ইব্রাহিম শর্কীর শাসনকালে আলীমুল উলামায় বিভূষিত হন। কিতাবে লেখা আছে যখন উপরোক্ত পুস্তকের শিক্ষা গ্রহন করতেন, তখন আপন কামরার দরজা বন্ধ রাখতেন এবং রোজা রাখতেন। ঐ কিতাব পড়ার পর ফুসুসুল হিকম কিতাব পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন মাদার সাহেব বলেন রুহানী ইল্ম অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে না। উহা বুজুর্গের দ্বারা সিনায় সিনায় প্রাপ্ত হয়। এরপর উনি মাদার সাহেবের থেকে নিসবতে মাদারিয়া প্রাপ্ত হয়। ওনার মাজার জৌনপুরের মহল্লা সিপাহ তে আছে। জৌনপুর থেকে সরকার যখন মাকানপুর আসে তখন ওখানকার লোক খুব দুঃখী ও উদাস হয়ে যায়। কিছু মানুষ ওনার সঙ্গে মাকানপুর আসে এবং মাকানপুরেই রয়ে যায়।

জাদুগর দের ইসলামে দাওয়াত

যখন মাদার সাহেব মাকানপুরের উদ্দেশ্যে চললেন তো রাস্তায় এক এমন গ্রাম ছিল· যেখানের অধিকাংশ মানুষ যাদুগর এরা যাদু দ্বারা পাগল ও অন্ধ করে দিত। মাদারুল আলামিন গ্রামের বাইরে থেমে গেলেন, যাতে ঐ সব যাদুগর দের অমানুষীক কার্য কলাপ বন্ধ করা যায়। এবং সাধারন মানুষকে নিশানা না বানাতে পারে, অতপর তিনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অবগত করালেন যাদুগররা ওনার উপর যাদু শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাদার সাহেবের উপর এ যাদু কোনো প্রভাব পড়লো না। এতেই যাদুগররা বুঝে ফেলল ওনার সাথে লাগা ঠিক হবে না। এরপর মাদারুল আলামিনের নিকট এসে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিল, হুজুর ওদের ক্ষমা করে দিলেন এবং সবাইকে ইসলামের দিক্ষা দিলেন।

এক পুত্র হারা মায়ের আবেদন

তারিখে সলাতীনে শর্কিয়া তে লেখা আছে একদিন এক মহিলা মাদার সাহেব এর সেবায় এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল হুজুর আমি বহু মান্নত করে যদিও বা একটি পুত্র সন্তান পেয়েছিলাম সেও আমাকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেছে। আমার দুনিয়া উজাড় হয়ে গেছে আপনি যদি একটু দয়া করেন তবে আমি আমার সন্তান ফিরে পায়।দয়া করে আমার বাচ্চার জন্য দোয়া করুন। যাতে আমার বাচ্চা আমি আবার ফিরে পায়। হজরত মাদার সাহেব মহিলার ওই অবস্থা দেখে খুব দুঃখীত হলেন। মাদারুল আলামিন কৃপা করলেন ও দোয়া করলেন এবং লাসের নিকট এসে বললেন কুম বেইজ্নিল্লাহ (আল্লাহর হুকুমে ওঠ) এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাচ্চা কলমা পড়তে পড়তে উঠে বসল এবং বলল হুজুর এই সংসারের সুখে কিছু ভালাই নেই, কিন্তু পরলোকের সুখ বাস্তব সুখ,আপনি আমাকে ওপারে পাঠিয়ে দিন। এরপর মাদার সাহেব কনৌজ এলেন যেখানে মখদুম জহাঁনিয়া জহাঁগস্ত কে খিলাফত দিয়েছিলেন। এর কিছু সময় পর হুজুর মাকানপুর ফিরে এলেন।

পল্লরায়ের ঘটনা

কনৌজের পার্শ্ববতী এলাকায় পল্লরায় নামে এক রাজা ছিল।হজরত শাহ মাদারের (রাঃ) খ্যাতি যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন সে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাকানপুরে হুজুরের সামনে উপস্থিত হয়, এবং বলল হুজুর আপনি লাখো লাখো লোকের মনোস্কামনা পুরন করেছেন। হাজার হাজার মানুষের দুঃখ কষ্ট দুর করেছেন। অনেক নিঃসন্তানের জন্য দোয়া করায় তারা সন্তান পেয়েছেন। আমি ওই রুপ দুঃখীদের মত এক অভাগা যার কোনো সন্তান আদি হয়নি। আমার জন্য দোয়া করুন। হজরত মাদার সাহেব পল্লরায়ের জন্য দোয়া করলেন।
কিছুদিন পর পল্লরায়ের এক বাচ্চা হয়। যা কেবল মাংস পিন্ড।উহা নিয়ে পল্লরায় মাদার সাহেবের নিকট আসেন, এবং বিনয়ের সঙ্গে বলেন হুজুর এ কেমন বাচ্চা দিয়েছেন যার শরীরের কোনো অর্থ নেই, কেবল মাংসের টুকরো। সেই মাংসের টুকরো কে ওনার সামনে আনতে বললেন এবং ঐ মাংস টুকরোর দিকে তাকিয়ে

থাকলেন। দেখতে দেখতে উক্ত মাংসের টুকরো থেকে হাত পা মাথা বের হয়ে উক্ত বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস চালু হয়ে গেলো।
হজরত মাদার সাহেবের এই করামত দেখে পল্লরায় তার স্ত্রী কে নিয়ে মুসলমান হয়ে গেল, পল্লরায়ের এই পুত্রের নাম রাখেন আল রায়.যিনি হিন্দি ভাষায় এবং বড় কবি. এই আল রায় মাদার সাহেবের বহু কবিতা লিখেছেন। হিন্দিতে এক কবিতার মুখড়া- দো জগ য়া শাহ মাদার কহিয়ো। অধিকাংশ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন পল্লরায়ের বারো পিড়ি পর্যন্ত এক এক করে সন্তান হয়। এরপর মাদার রায় নিঃসন্তান হয়। উনি আবার মাজারে গিয়ে কান্না কাটি করেন এবং দোয়া চাহেন। ফলে উনিও সন্তান প্রাপ্ত হয়,, যাদের নাম যথাক্রমে হসমত রায় ও জোত রায় যাদের বংশ ধারা এখনো চলে আসছে।

ইসন নদী

একদিন হুজুর মাদারে পাক এক খলিফা ইয়াসিন শাহকে পানি আনতে বললেন এই ইয়াসিন শাহ বড় চমৎকারী ও বিদ্যান বুজর্গ ছিলেন, পানি আনতে গিয়ে পানি কোথায় না পেয়ে ফিরে এসে হুজুরকে বললেন পানি কোথাও পেলাম না। হুজুর ঐ কথা শুনে ইয়াসিনকে নিজের আশাবাড়ি দিয়ে বললেন যাও এই ছড়ি দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে এক লাইন টেনে দেবে তুমি পানি পেয়ে যাবে।
হজরত ইয়াসিন শাহ মাঠে চলে গেলেন এবং এক রেখা টেনে দিলেন ফলে এক নদী বইতে শুরু হল। যে নদী আজো ইসন নদী নামে জানা যায়।
নোট:- এই নদী প্রথমে ইয়াসিন নদী নামেই ছিল পরবর্তীকালে ইসন নদী নামে বিখ্যাত হয়। এই নদীর পানিতে আল্লাহ পাক বহু গুন দিয়েছেন, এই নদীর প্রতি মানুষের খুব শ্রদ্ধা। কোনো রোগী এই নদীতে গোসল করলে তার সেরে যায়, লোক এর পানিকে সির্ন্নি হিসাবে ঘরে নিয়ে যায়।

মাবর শরীফে হুজুর মাদার পাকের ফয়েজ

মাকানপুর শরীফ থেকে প্রায় ১০৫-১১০ কিমি দুরে মাবর নামে এক গ্রাম আছে, ওখানে এক বিশাল বিদ্যান হজরত কাজী মুতহর কল্লাশের এসেছিলেন যখন উনি জানতে পারলেন মাকানপুর শরিফে এমন এক পন্ডিত ও সুফি এসেছেন যিনি না কিছু খান এবং না কিছু পান করেন। এবং তিনি বস্ত্র বদল করেন না। তো ওনার সঙ্গে কাজী সাহেবের দেখা করার খুব ইচ্ছা হল। কাজী সাহেব ২০০ শিষ্য কে সাথে নিয়ে মাদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হয়ে পড়লেন।হজরত মাদার সাহেব জানতে পেরে আপন মুরিদান ও খলিফাদের বলে দিলেন। দেখো এক বড় আলিম আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ওকে কেউ কিছু বলবে না যা বলার আমি বলবো।
যখন কাজী মুতহার কল্লাশের ওনার কাছে এলেন তো মাদার সাহেব খুব প্রেমের সঙ্গেই তাকে নিজের পাশে বসালেন, একদিকে যেমন কাজী সাহেবের জ্ঞানের গর্ব

ছিল অন্যদিকে মাদার সাহেবের কাছে হুজুর নবী-এ-করীম সাঃ এর দেওয়া দয়ালু এবং মৃদালু স্বভার ছিল।

কিছু সময় পরে কাজী সাহেব আল্লার অস্তিত্ব নিয়ে কথা শুরু করল। যা এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল। অবশেষে কাজী সাহেব হেরে যান। এরপর প্রশ্ন করলেন, আপনি খানা খাননি কেন ? সংসার এক দিন স্বরুপ আমি না খাওয়ার ব্রত রেখেছি কাজী সাহেব বলেন কেমন করে আপনি এফতার করেন আর শেহরী বা কখন করেন। এরপর মাদার সাহেব রেগে গিয়ে কাজী সাহেবের ঘাড়ে ধরে আপন বগলের নীচে চেপে ধরলেন এবং বললেন দেখ (ঐতিহাসিক গন লিখেছেন যে ওটা রাত্রের সময় ছিল) কাজী সাহেব চমকে উঠলেন রাত্রি বেলা সূর্য দেখে।

এরপর কাজী সাহেবের চিন্তা ভাবনার বিশাল পরিবর্তন হল। হজরত মাদার সাহেব বললেন সূর্য্য আমার চোখের সামনে থেকে কখনোই অদৃশ্য হয় না। এরপর ওনার নকাব তুলে দিলেন। ফলে কাজী সাহেব তিন দিন বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলেন। মাদার সাহেব ওনার খলিফা শাহ আলা নাগোরী কে বললেন আমার অজুর অবশিষ্ট পানিতে পানি মিশিয়ে ওদের মুখে উক্ত পানি ছিটিয়ে দাও।

হজরত শাহ আলা নাগোরী ঐ নির্দেশ পালন করার পর কাজী সাহেব সহ ওনার সব শিষ্যদের হুঁস হল। তখন শাহ আলা সবাইকে হুজুরের সামনে নিয়ে এল হুজুর তাদের মুরিদ করে সৈয়দ আহমদ বাদিয়া এবং জানমান জান্নাতীর নিকট সৎ সঙ্গের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ইনি সেই কাজী মুতহর কাল্লাশের যাঁর থেকে মাদারিয়া -সিসিলার -গোরহ- আশিকান শাখার শুরু হয়।

হাসিয়া:- কাজী মুতহর কাল্লাশের এর আদর্শ ছিল কখনোই মাদার সাহেবের দিকে পিঠ বা পিছু না করা। এমন কি যখন মাবার শরীফ যেতেন তো উনি উল্টো চলতে থাকতো। কিতাবে তে লেখা আছে যে কাজী সাহেবের এত বড় পুস্তক ভান্ডার ছিল যে যখন উনি হুজুর মাদার সাহেবের নিকট আসেন ঐ কিতাব আসতে দুশো উট লেগেছিল। কাজী সাহেব হুজুর কে এত ভালো বাসত সে জন্য ওনার উপনাম আশিক দিয়ে ছিলেন এবং গোরহ আশিকানের ভক্তরা কাজী সাহেবের অনুসরনানুসারে রৌজার দিকে পিঠ করে না।

গোরহ আশেকানে বহু বড় বড় মলঙ্গ ছিল যাঁরা প্রকান্ড বিদ্যান ছিল। আব্দুল গফুর উর্ফ বাবা কপুর মজজুব গ্বোয়ালিয়রী যার আলোচনা আব্দুল হক মহদ্দিস দেহলবী করেছেন।

হজরত হিসামউদ্দিন সালামতী (রাঃ) কিতাব তৌহফতুল অবরারফী মনাকিব এ কুতুবুল মাদার-এ লিখেছেন যখন হুজুর মাদার সাহের নিজের হুজরায় ইবাদত রিয়াজত (ধ্যান, তপস্যা) করেন তখন কারোকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন না। কেন না ঐ সময় নিজের নেকাব তুলে দিতেন জীনেদের বাদশাহ ইমাদুল মুল্ক ওনার দরোয়ানের কার্য করতো। হজরত হিসামুদ্দিন সালামতী মাদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। উনি খুব লম্বা যাত্রা করেছেন যাতে মাদার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। যখন উনি চাইলো ভেতরে গিয়ে একটি বার

হুজুরের সঙ্গে দেখা করে আসবে তো ইমাদুল মুল্ক দারোয়ান বলল এই সময় হুজুরের বে নেকাব থাকে সেজন্য কারোর ভেতরে যাবার হুকুম নেই। হজরত হিসামুদ্দিন বলল আমি বিরহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি আমি ওনার দর্শন বিনা এক মুহুর্ত থাকতে পারবো না। বার বার মানা করার সত্বেও উনি হুজরার ভেতরে চলে গেলেন এবং দেখলেন উনি বাস্তবে বে নেকাব এবাদতে বসে আছেন। হিসামউদ্দিনকে দেখে হুজুর বললেন হেত বে আদবে বখুদা ন রসীদ অর্থাৎ বেআদব খোদা পর্যন্ত পৌছতে পারে না এবং হিসামউদ্দিনের দিকে দেখতেই হিসামউদ্দিনের শরীরে জ্বলন শুরু হয়ে যায়। তখন হিসামউদ্দিন বিনয়ের সুরে বলেন যদি আমি বেআদবী না করতাম তবে জমালে-এ- নুরে খুদা দেখার সৌভাগ্য আমার হত না।

এই উত্তরে হজরত খুব খুশি হলেন এবং বললেন সালামতী, সালামতী, সালামতী (শান্তি, শান্তি, শান্তি)।

এরপর মৌলানার শরীরের জ্বলন ঠান্ডা হয়ে গেল। এবং মনে শান্তি এল এই দিনের পর থেকে মৌলানা হিসামউদ্দিন কে সালামতী নামে জানা যায়।

হজরত খাজা সৈয়দ আবু মহম্মদ অরগুন :-

ইনি ভাইদের মধ্যে সবার থেকে বড় এবং মাদার সাহেবের উত্তরাধিকারী, ওনার থেকে বহু কারামত দেখা যায় ওনার বিশেষত্ব লেখা মুসকিল। যখন জিকির করতেন তো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে আজিব আজিব শব্দ বের হত। এই কারনে হুজুর ওনাকে আরগুন উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি খুব সুন্দর সুশীল এবং মৃদালু স্বভাবের ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর কোরয়ান তিলাওয়াত করতেন।

একদিন যখন তিনি তেলায়য়াত করছিলেন ঐ সময় হজরত শাহ হামিদ অসকহানী (রাঃ) ওখানে উপস্থিত হয় তো ওনার এমন অবস্থা হয় যে অঞ্জান হয়ে পড়ে যায়। তেলাওয়াত করার পর হজরত হামিদ কে জিঞ্জাসা করেন এখন কেমন আছো ও ওনার পায়ের উপর পড়ে গেল। তো উনি হজরত হামিদ কে তুলে বুকে লাগালেন তবেই হজরত হামিদ শান্তি পায়। হজরত হামিদকে মাদারিয়া সিলসিলায় দাখিল করে নিলেন।

আপনারা পড়েছেন যে এই তিন ভাই মাদার সাহেবের ভাইয়ের সন্তান। যখন সরকার এদের নিজের সাথে করে নিয়ে আনে তো ওনার কিশোর অবস্থা ছিল অতপর ওদের লালন পালন শিক্ষা ইত্যাদির ভার হুজুর নিয়ে ছিলেন। সুতরাং ওরা ও অবিবাহিত ছিল।

একদিন হজরত কাজী মতহর কাল্লাশের ঐ তিন ভাইকে বললেন তোমরা বিবাহ করে নাও তাহলে হুজুরের বংশ বৃদ্ধি হবে।

তিন ভাই বললেন আমরা সৈয়দনা মাদারুল আলামিনের জীবনাদর্শ মত চলতে চাই।সুতরাং আমরা সংসার জীবন থেকে দুরে থাকতে চাই।এই কথা মাদার সাহেবের কানে পৌছল।মাদার সাহেব ওনাদের বললেন,তোমাদের বংশ কয়ামত পর্যন্ত চলবে।আর এই বস্তি তোমাদের দ্বারা আবাদ হবে।সুতরাং তোমরা বিবাহ করে নাও।

শাহাজাদারা হুজুরের সামনে কিছু না বলে কাজী মাহমুদের মাধ্যমে মিনতি করে,অবিবাহিত জীবন কাটানোর জন্য।তখন মাদার সাহেব ওনাদের কাছে ডেকে বললেন,তোমরা চোখ বন্ধ করে নাও,তিনজন চোখ বন্ধ করে লৌহে মাহফুজে দেখতে পান,নিজেদের বিবাহ ,সন্তানাদি এবং বংশ। সুতরাং ওনাদের দিয়ে বংশ বৃদ্ধি ও তাদের দিয়ে ধর্মের প্রচার এবং প্রসার ইত্যাদি কয়ামত পর্যন্ত থাকবে।যখন চোখ খুলল,উপস্থিত খলিফারা জিজ্ঞাসা করায়,তিন হজরত সব কিছু বলে দিলেন।এরপর তিন শাহাজাদার বিবাহ সম্পন্ন হল। হজরত খাজা অবু মহম্মদ অরগুনের বিবাহ হয় কাল্পীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ বিন বিলায়তুল্লাহর বেটী জন্নত বীবীর সঙ্গে।

খাজা সৈয়দ আবু তুরাব ফন্সুর এর বিবাহ হয় মালিক বুরহান বিন সালার এর কন্যা বীবী আবিদার সঙ্গে। এবং খাজা সৈয়দ আবুল হোসেন তৈফুরের বিবাহ হয় সৈয়দা অম্বীর সঙ্গে। ওনাদের বংশ থেকেই গোরহ (শাখা) খাদেমান জারী হয়। আর এ খাদেমান শাখা বা গোরহ থেকে ৭ (সাত) উপশাখা জারী হয়; তা নিম্নরুপ

১/ অরগুনী- সৈয়দ আবু মহম্মদ অরগুন থেকে।
২/ ফন্সুরী- সৈয়দ আবু তুরাব ফন্সুর থেকে।
৩/ তৈয়ফুরী- সৈয়দ অবুল হোসেন তৈফুর থেকে।
৪/ সলৌতরী- শাহ মুহম্মদ সলৌবর থেকে।
৫/ সরমৌরী- শাহ মুহম্মদ সরমৌরী থেকে।
৬/ সিকন্দরী- শাম মুহম্মদ সিকন্দর থেকে।
৭/ ইবনী- খাজা সৈয়দ শাহ ইবন থেকে।

বিসধন এর জাদুগর

মাকানপুর শরীফের নিকটেই বিসধন নামে এক গ্রাম আছে, যার সম্বন্ধে কিতাবে লিখেছেন। একদিন খাজা সৈয়দ অবুল হসন তৈফুর (রাঃ) ঘুরতে ঘুরতে বিসধন পর্যন্ত পৌছলেন। ওখানে দেখলেন এক ব্যক্তি বায়ুতে ভাঁষছে সে জখন ইচ্ছা পৃথিবীতে আসতে পারে, এবং যে ব্যক্তির দিকে ঘুরে দেখতো তো সে জ্বলে যেতো। এলাকার মানুষ ওই মানুষকে খুব ভয় করতো যখন খাজা তৈফুর (রাঃ)কে সংস্কৃত ভাষায় এক প্রশ্ন করে, তো উনি ভেবে ছিল সংস্কৃত ভাষা খাজা তৈফুর জানে না, সুতরাং ওনার কথায় উত্তর দিতে পারবে না কিন্তু জাদুগর অপ্রস্তুতিতে পড়ে গেল। খাজা তৈফুর (রাঃ) যখন ওনার উত্তর সংস্কৃত ভাষায় দিলেন, এরপর উক্ত যাদুগর মাদার সাহেবের নিকট এলেন এবং ইসলাম কবুল করে নিলেন।

হাসিয়া:- এই ঘটনাকে ঐতিহাসিকরা অনেক ভাবে ব্যাখা করেছেন যেমন এক লেখক লিখেছেন খাজা আবুল হসন তৈফুর এবং মাদার সাহেব এক সাথে ছিলেন এবং প্রশ্ন উত্তর মাদার সাহেবের সঙ্গে হয়।

মাদারে আজম কিতাবে লেখা আছে যখন হুজুর মাদারে আজম ঐ নির্জন স্থানে (মরাকাবায়) ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, ঐ ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা করে এক জাদুগর। হুজুরের পাহারাদার ইমাদুল মুল্ক ওকে এক থাপ্পড় মারে কিন্তু জাদুগর ওকে দেখতে

পায়নি কারন সে জীন ছিল। এতে জাদুগর প্রভাবিত হয়ে ইমান আনে এবং জাদুগর সাফাই করার কাজ করতো। ইনার নাম দেন খের উদ্দিন উর্ফ মক্কন সরবাজ। ইনার মাজার হয় মাকানপুর শরীফের দক্ষিন দিকে। ওনার উরুশ হয় চৈত্র মাসের ১ম সোমবার।

মক্কন সরবাজ মাদারী

বুজুর্গদের মুখে শোনা যায় মক্কন সরবাজ মাদারী হজরত মাদার সাহেবের খলিফা তথা মাদারিয়া সিলসিলার এক বড় বুজুর্গ ছিলেন। উনি মান্নত করেছিলেন যে সরকারের সাদা গম্বুজের উপর সোনার কলস চড়াবে। যখন মান্নত পুরা হয়ে যায় তখন উনি ওনার সারা জীবনের উর্পাজন দিয়ে একটি সোনার কলসী তৈরী করে এবং নিয়ে যখন আসছিল পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে, তখন ও একটি তেতুল গাছের কোটারে লুকিয়ে পড়ে। ডকাতেরা রাত্রের মধ্যে উক্ত গাছকে অনেক চেষ্টা করেও না কাটতে পেরে সকাল বেলা সব পালিয়ে যায় উনি তখন বাইরে আসে এবং কলসী মাজারে চড়িয়ে তবে আসে।

ইব্রাহিম শর্কীর চড়ানো কলসী আজো শোরুমে রাখা আছে সুতরাং এই সম্বন্ধে এক বৃদ্ধা বলেন সরপর আরে চলে ফির ভী পুকারে দম মদার।

অর্থাৎ মাথার উপর দিয়ে করাত চলে যায় তবুও সে বলে দম মদার।

বীবী বাহোর

কিতাব গুলজার-এ- মাদার এর পৃষ্ঠা ১৩৬-তে লেখা আছে মাকানপুর শরীফের পাশেই উপস্থিত দেবহা নামে এক গ্রাম ওখানে এক বিদ্যান আরিফা তথা কারামতী মহিলা থাকতো। আলোচনা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু উনি সব সময় উলঙ্গ থাকতো, লোক জিজ্ঞাসা করলে বলতো কোনো পুরুষ আমার চোখে পড়ে না। কাকে দেখে আমি কাপড় পড়বো কিন্তু যখন থেকে মাদার সাহেব মাকানপুরে এলেন তখন থেকে ও কাপড় পড়া শুরু করলো।লোক জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন আমাদের পাশেই এক বুজুর্গ আরিফ কুতুবুল মাদার এসেছেন, যিনি হুসেনের আওলাদ। ওনাকে দেখে আমার শরম হয়। সেজন্য আমি পর্দা করি।

খাজা ফন্সুরের কেরামত

হজরত আব্দুল রজ্জাক বীনা এক ধনী ব্যক্তি সুপুত্র ছিল শিশু অবস্থায় বসন্ত রোগের স্বীকার হয়। রোগ এত প্রবল ছিল যে এর ফলে দুটি চোখ এবং একটি পা হারাতে হয়।টাকা পয়সার অভাব না থাকায় উনি শিক্ষার কিছু কম করেনি তিনি হাফিজ ও কারী হয়েছিলেন একবার এক হাফিজ এক কিয়াম পড়ছিল তো উক্ত হাফিজের ভুল ধরেছিল, ফলে তার রাগ হয় এবং বলে, এই অন্ধ কি জানিস রে? এই অন্ধ কথাটি হাফিজ আব্দুল রহমান এর দীলে যেন কাঁটার মত লাগল যখন মাদার সাহেবের সম্বন্ধে খবর পেল তো উনি ওনার এক দাসের সঙ্গে মাকানপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দিলেন যদি ও তিনি অন্ধ ও খোঁড়া ছিলেন

তবুও মনের জোর ছিল প্রবল। আসার সময় এক জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে সেখানে খিজির আঃ ওনাকে একেবারে কুতুবুল মাদারের দরবার পর্যন্ত পৌছে দিয়ে যায়। এখানে খাজা ফন্সুর (রাঃ) এক খাদিম কে দিয়ে হাফিজ সাহেব কে নিজের কাছে ডেকে আনলেন, এবং যে পাঁচ সুরা পড়ছিলেন বললেন এতে এরাব অর্থাৎ জের জবর পেশ লাগাও। হাফিজ সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। আবার পুনরায় খাজা সাহেব বলেন কলম দোয়াত মৌজুদ আছে এরাব লাগিয়ে দাও। তখন মুহুর্তেই উক্ত হাফিজের দু চোখেই জ্যোতি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাফিজ সাহেব ওনার পায়ে পড়ে গেলেন। প্রথমে হাফিজ সাহেব খাজাকেই মাদার সাহেব ভাবছিল।

কিন্তু লঙ্গর খানায় জানতে পারলো উনি মাদার সাহেবের পিয়ারাদের মধ্যে একজন এরপর হাফিজ সাহেব কে মাদার সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। ওনার মাজার ও মাকানপুর শরীফেই আছে, যা হাফিজ বীনা নামে বিখ্যাত।

খাজা সৈয়দ আবুল হসন তৈয়ফুর

খাজা সৈয়দ আবুল হসন কে তৈফুর এই জন্য বলা হল, উনি সুলুকে কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে উচ্চ মনযিলে পৌছয়। তৈয়ফুর, খুব উচ্চ আকাশে উড়তে পারে এমন পায়রা কে বলে। একবার দুর্ভিক্ষ আসে ফলে মানুষ নিজ নিজ ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে থাকে। অনাহারে চারিদিকে মৃত্যু হতে থাকল। মানুষ জন ওনার সেবায় এল এবং বলল হুজুর এই দৈবীয় মুসিবত থেকে আমাদের বাঁচান। খাজা সাহেব ওদের জন্য দোয়া করলেন এবং বৃষ্টি হতে লাগল আর দুর্ভিক্ষ দুর হয়ে গেল।

হুজরত মাদার সাহেবের পর্দা নেওয়ার সময়

যখন হজরত মাদার সাহেবের পর্দা নেওয়ার সময় হল তখন খাজা সৈয়দ অবু মহম্মদ অরগুন, খাজা সৈয়দ আবু তুরাব ফন্সুর খাজা সৈয়দ আবুল হসন তৈয়ফুর কে আপন উত্তরাধিকারী ঘোষনা করলেন। এবং তাদের নিয়ে মুরিদান দের উদ্দেশ্যে বললেন আমার পরপারে যাবার সময় হয়ে গেছে, তোমরা দুঃখ কোরো না। এই তিনজন রইল ওরা তোমাদের প্রয়োজন পুরন করবে। আমি অন্তর লোক থেকে তোমাদের মদত করতে থাকবো। সুতরাং তোমরা যখন খুশি যেখানে ইচ্ছা ডাকবে। আমি তখনি তোমাদের ফরিয়াদ শুনবো।

এরপর তিনি বললেন আমার জানাজা নামাজ পড়াবে মৌলানা হিসাম উদ্দিন সালামতী আর গোসল বা কাফনের দায়িত্ব ফেরেস্তাদের সুতরাং তোমরা আমার গোসলের পানি ভরে হুজরার রেখে দিও। এরপর সারারাত কোরান শরীফ পড়ার আওয়াজ আসছিল। হুজরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল ভোরের সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বুঝতে পারে মাদার সাহেব আর ইহ জগতে নেই। ইন্নালিল্লাহে ……………।।ওনার ওসিয়ত অনুযায়ী হিসামউদ্দিনই জানাজার নামাজ পড়ায়।

নোটঃ- এই সম্বন্ধে লিখেছেন যে ওনার শেষ সময়ে মৌঃ হিসাম উদ্দিন জৌনপুরে ছিলেন ওনাকে সরকার স্বয়ং গিয়ে মৃত্যু সংবাদ দিয়ে ডেকে আনেন। যখন মৌঃ হিসাম উদ্দিন হুজরার দরজায় হাত লাগায় তো উক্ত দরজা খুলে যায়।

দরগাহ পীর হনীফ মদারী বলরামপুর

৮৩৮ হিঃ তে হুজুর মদার পাকের মৃত্যু হয় এর আগে বহু বুজুর্গ কাদিরিয়া চিস্তিয়া সিলসিলার সঙ্গে সঙ্গে সিলসিলা মাদারিয়া ও নিস্বত হাসিল করেছেন। ওনাদের মধ্যে এক বুজুর্গ সরখীলে মলঙ্গ গান-এ- দৌরাঁ-তাজুল আরিফিন সৈয়দনা মলঙ্গ পীর হনিফ মদারী।

মলঙ্গ হানিফ পীর মদারী বড় চমৎকারী বুজুর্গ ছিলেন।ওনাকে মাদার সাহেব বলরামপুর থেকে মথুরা পাঠিয়েছিলেন। ওনার মাজারে গিয়ে আজো বহু মানুষ উপকৃত হয়। ওখানের কুঁয়োর পানি আজো মানুষ বিশ্বাস করে নিয়ে যায় সুস্থ থাকার জন্য ।

পীর হানিফ এর জীবনেই লাখ লাখ মুরিদ ছিল। ৬ই ফেব্রয়ারী ১৯২৮ তে শাহজাহান বহরাইচ হয়ে এই এলাকায় এসে ছিল, এবং ওর সমস্যার জন্য ও গদ্দী সুরক্ষার জন্য মান্নত করেছিল।পরবর্তী কালে মকবরা বানিয়ে বেশ কিছু জমি দিয়েছিল দরগাহের জন্য ।

পীর হানিফ মদারীর সেজরা

হুজরত	মুহম্মদ	মুস্তাফা	(সাঃ)
হুজরত	মৌলা	আলী	করমল্লাসহ
হুজরত	হসন	বসরী	(রাঃ)

হুজরত হবীবে আজমী (রাঃ)
হুজরত সৈয়দ বদীউদ্দিন জিন্দাশাহ মাদার (রাঃ)
হুজরত সৈয়দনা পীর হানিফ মাদারী (রাঃ)

হুজরত সৈয়দ অব্দুর রহমান উর্ফ বাবা মলঙ্গ মাদারী

আল্লাহ পাকের খাস বান্দাদের বহু কারামত প্রকাশ পায় যার দ্বারা মানুষ হিদায়ত ও শান্তি প্রাপ্ত হয়। আবার ঐ সব লোক ভাল হয় না সে জন্য তাদের বহু যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। তাদের মধ্যে একজন বাবা হাজী মলঙ্গ মাদারী। ওনার সঙ্গে ঐ রুপ ব্যবহার হয়ে ছিল।

মলঙ্গ মাদারীকে ইসলামের দাওয়াত দিতে নিষেধ করা সত্তেও যখন উনি কথা শুনল না তখন কিছু মানুষ এই সিদ্ধান্তে এল যে ওনাকে আগুনে ফেলে মারা হবে। সুতরাং এক স্থানে বহু জ্বালানী কাঠ জড়ো করে আগুন লাগিয়ে উক্ত আগুনে মলঙ্গ মাদারীকে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্ত মানুষ দেখলো উক্ত আগুন মলঙ্গ মাদারীকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

যখন মানুষ এই ঘটনা দেখল যে এত বড় আগুন ওনার কিছু ক্ষতি করতে পারল না। তখন বহু মানুষ ইমান আনলেন।কিছু মানুষ ইমান না আনলেও ওনার সাহায্য কারী হয়ে গেল। এরপর তিনি পাহাড়ের উপড়ে চড়লেন সঙ্গে ছিলেন পীর ভাই হজরত বক্তিয়ার শাহ মাদারী ও সুলতান শাহ মাদারী।

পাহাড়ের উপর ডাকাত ও বন্য পশুদের ভয় ছিল,যখন ওনার নারা দিয়েছেন তখন ডাকাত দল ওনাদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হয়। কিন্তু বন্য পশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে উক্ত পশুরা ওনার সুরক্ষার জন্য লেগে গেল। এই দেখে তো ডাকাত দল ভয় পেয়ে গেল। এবং হয় কারামত এই যে ওনার হাতের আশা পাহাড়ের উপর মারতেই তা থেকে পানি বের হয়ে পুকুর তৈরী হয়ে গেল।

এরপর ওখানের ডাকাত দল ইমান নিয়ে এল ওনার মামা সেখ হবীব যে মাটি দিয়ে ছিল উক্ত মাটির তুলনা, তিনি পাহাড়ের মাটির সঙ্গে করেন। সুতরাং তিনি ওখানে চিরদিনের জন্য থেকে গেলেন।

সুলতান ইব্রাহিম শাহ আদিল সানী সন ১০৪৭ হিঃ তে হজরত আব্দুরহমান য়মনী উর্ফ হাজী বাবা মলঙ্গ যখন মাকানপুর থেকে কোকনে পৌছয় সেখানে ওনার মাজার আছে। সেখানের মানুষ ওনাকে অত্যাচার করেছিল জখন আদিল শানীর জ্ঞান হল তখন ওনার সাহায্যর জন্য কিছু সৈনিক পাঠিয়ে ছিল। তহসিল কার্যালয় থানার সার্ভে নং ১১৩৪ অনুসারে দেখা যায় ওনাকে কিছু জায়গা ও দিয়েছিলেন যাতে উনি ওখানে শান্তিতে থাকতে পারে। এই ভাবে ইংরেজদের আমলেও ঐ রুপ ছিল, এমন কি এখন মহারাষ্ট্র সরকার এলাকায় সাড়ে বারো বিঘা জমীন দরগাহ নামে করে দিয়েছেন।

পাহাড়ের উপরে যেসব মানুষ আছে তারা নিজেদের বৌদ্ধিষ্ট বলে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি কোনো ধ্যান দিত না। ডাকাতরা আপন সরদার কে দেবা আজমল বলে যে কিনা বড় যাদুগর ছিল। হাজী মলঙ্গ কে যাদুগর পছন্দ করতো না বরং ওনার উপর অত্যাচার করতো। যাদুগর ওনাকে তাড়ানোর জন্য নিজের মেয়েকে পাঠায় যাতে হাজী মলঙ্গ পাহাড়ে থাকতে না পারে। কিন্তু ওনার কারামত দেখে মেয়েও মুসলমান হয়ে গেল। ওর নাম ফাতিমা রাখল। এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হল।

বাবা মা মেয়ে মুসলমান হওয়ার খবর শুনে খুব রেগে গেল কিন্তু কিছু করার ছিল না। বরং বাবার সেবায় এসে মিনতি করে বললো যত খুশি ধন দৌলত চাই নিয়ে তার পরিবর্তে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। এ কথাবার্তা শুনে মেয়ে মা বাবা সঙ্গে যেতে রাজি হল না।

এরপর ঐ সব মানুষ ওনার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলো, এতে বাবার খাস সুলতান শাহ সহ পাঁচ অন্য মুরিদ ও শহীদ হয়। যাদের মাজার উক্ত পাহাড়ের উপর আছে। এই শহীদদের জন্য বাবা বলেন, যদি কেহ কিছু পেতে চায়, যেন প্রথমে ওদের মাজারে ফাতেহা পড়ে।

জুনা গড়ে হজরত মাদার সাহেব

যখন মাদার সাহেব (রাদিঃ) জুনাগড় পৌছয় তো ওখানে মানুষ খেকো বা আদম খোর সৈয়দ মুহম্মদ জামাল উদ্দিন জানেমন জন্নতী কে হিরনার পাহাড়ে খেয়ে নেয়, হুজুর বুঝতে পারলেন, এবং আওয়াজ দিলেন জান-এ-মান তুমি কোথায় ? উনি বললেন হুজুর সবার পেটের মধ্যে, হুজুর বললেন বের হয়ে এসো, উনি বললেন কোন দিক দিয়ে ? হুজুর বললেন- মাথার উপর দিয়ে এসো, এরপর সবার মাথার উপর দিয়ে বের হয়ে জীবীত হয়ে গেলেন।

পাহাড়ের উপর ওনার পায়ের চিহ্ন আজো দেখা যায়।

শিজ্‌রা এ জদিদয়া সৈয়দ মহজর আলী

হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা সাঃ।
হজরত মৌলাএ কায়নাত আলী করমল্লাহো ওজহু।
হজরত ফাতিমা জহরা রাঃ।
হজরত সৈয়দদুশোহদা ইমাম হুসৈন রঃ।
হজরত সৈয়দ ইমাম জৈনুল আবেদিন রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইমাম মুহম্মদ বাকর রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইমাম জাফর সাদিক রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইমাম ইসমাইল রাঃ।
হজরত ইমাম মুহম্মদ রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইসমাইল সানী রাঃ।
হজরত সৈয়দ জহীরুদ্দীন রাঃ।
হজরত সৈয়দ বহাউদ্দিন রাঃ।
হজরত সৈয়দ কাজী কিদবতুদ্দীন আলী হলবী রাঃ।
হজরত সৈয়দ মহমুদ উদ্দীন ভ্রাত: হজরত সৈয়দ বদীউদ্দীন আহমদ।
হজরত সৈয়দ জাফর রাঃ।
হজরত সৈয়দ অবু সইদ রাঃ।
হজরত সৈয়দ নিজাম উদ্দিন রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইস্‌হাক রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইসমাইল রাঃ।
হজরত সৈয়দ ইব্রাহীম রাঃ।
হজরত সৈয়দ দাউদ রাঃ।
হজরত সৈয়দ বজিহুদ্দীন রাঃ।
হজরত সৈয়দ কবির উদ্দীন রাঃ।
হজরত সৈয়দ আবদুল্লাহ রাঃ।
হজরত খাজা সৈয়দ অবু তুরাব ফান্সুর রাঃ।
হজরত সৈয়দ দরিয়া সইদ রহমতুল্লাহ অলৈহ ।
হজরত সৈয়দ রিজকুল্লাহে রহমতুল্লাহ অলৈহ।

হজরত সৈয়দ হজরত সৈয়দ অব্দুল্লাহ রাঃ।
হজরত সৈয়দ সলমান রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ অবদুল হামিদ রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ অব্দুল সসুবহান রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ সুররুল কুদদুস রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ অজমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ চাঁদ মদারী রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ অব্দুসসুবহান মুহদ্দিস রহমতুল্লাহ অলৈহ।
মৌলাই সৈয়দ খুশবক্ত আলী রহমতুল্লাহ অলৈহ।
হজরত সৈয়দ কুত্বে আলম সৈয়দ কলবে আলী।
হঃ মৌঃ কারী অলহাজ সৈঃ মহজর আলী।
মৌলাই অবুল বকার সৈঃ।

কল্বে আলী জাফরী মাদারীর ১০ পুত্র এবং ৩ কন্যা।
মৌঃ সৈঃ জুলফিকার আলী,মৌঃসৈঃ মুক্তার আলী,সৈঃ আলে আলী,সৈঃ কুদ্দুস আলী,সৈঃ সৈয়দ আলী,সৈঃ মুহররম আলী,হাজী সৈঃ মনজর আলী,মৌঃসৈঃবকার অহমদ,সৈঃ তফাকুর আলী সাহেব।এবং সৈঃ মহজর আলী।
পুস্তক এর লেখকের পুত্র ও কন্যা।
সৈঃ শজর আলী,সৈঃ য়াসির আলী,সৈঃ ঔসত আলী,সৈঃ ইকরা খাতুন,তাহা খাতুন,

শাজ্‌রা এ মুর্শিদিয়া হজরত সৈয়দ মহজর আলী

হজরত রসুলে মোয়জ্জম সাঃ
মৌলা আলী রাজিঃ
হজরত হাসান বসরী রাজিঃ
হজরত হাবিবে আজমী রাজিঃ
হজরত বায়জীদ বোস্তামী রাজিঃ
হজরত সৈয়দ বদিউদ্দীন কুতুবুল মাদার রাজিঃ
হজরত সৈয়দাবু মহম্মদ আরগুন রাজিঃ
হজরত সৈয়দ শাহ মহমুদ রহঃ
হজরত সৈয়দ খাজা প্যারে রহঃ
হজরত সৈয়দ শাহ শাহন রহঃ
হজরত সৈয়দ শাহ হম্মন রহঃ
হজরত সৈয়দ শাহ মহমুদ সানী
হজরত সৈয়দ মারুফ রহঃ
হজরত সৈয়দ শাহ মৌ আব্দুল জলীল রহঃ
হজরত সৈয়দ ফজলুল্লাহ

হজরত সৈয়দ প্যারে
হজরত সৈয়দ আব্দুল জলীল সানী (২য়)
হজরত সৈয়দখাজা নজমুদ্দিন
হজরত শাহ সৈয়দ সামসুদ্দিন
হজরত মৌলানা আবুল বকার সৈয়দ কল্বে আলী
হজরত সৈয়দ মহজর আলী জাফরী।।

Darga Address : Makanpur Sharif,
Dist : Kanpur (U.P), Pin : 209202.
E-mail : dummadar@yahoo.com
www.qutbulmadar.com
www.zindashahmadar.org
www.shahmadar.blogspot.com
www.dargahpirhanifmadari.com

Darga Address :
Ayma Mazar Sharif,
Ayma, Bawali, 24 Parganas (South)
E-mail : aymanamanzil@gmail.com
Phone : 9830924420